গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

BIGYAN ANNESWAK

ISSN 2582-5674

বর্ষ - ১৮ সংখ্যা-৫ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১ RNI : WBBEN/2003/11192 মূল্য : ১৫ টাকা

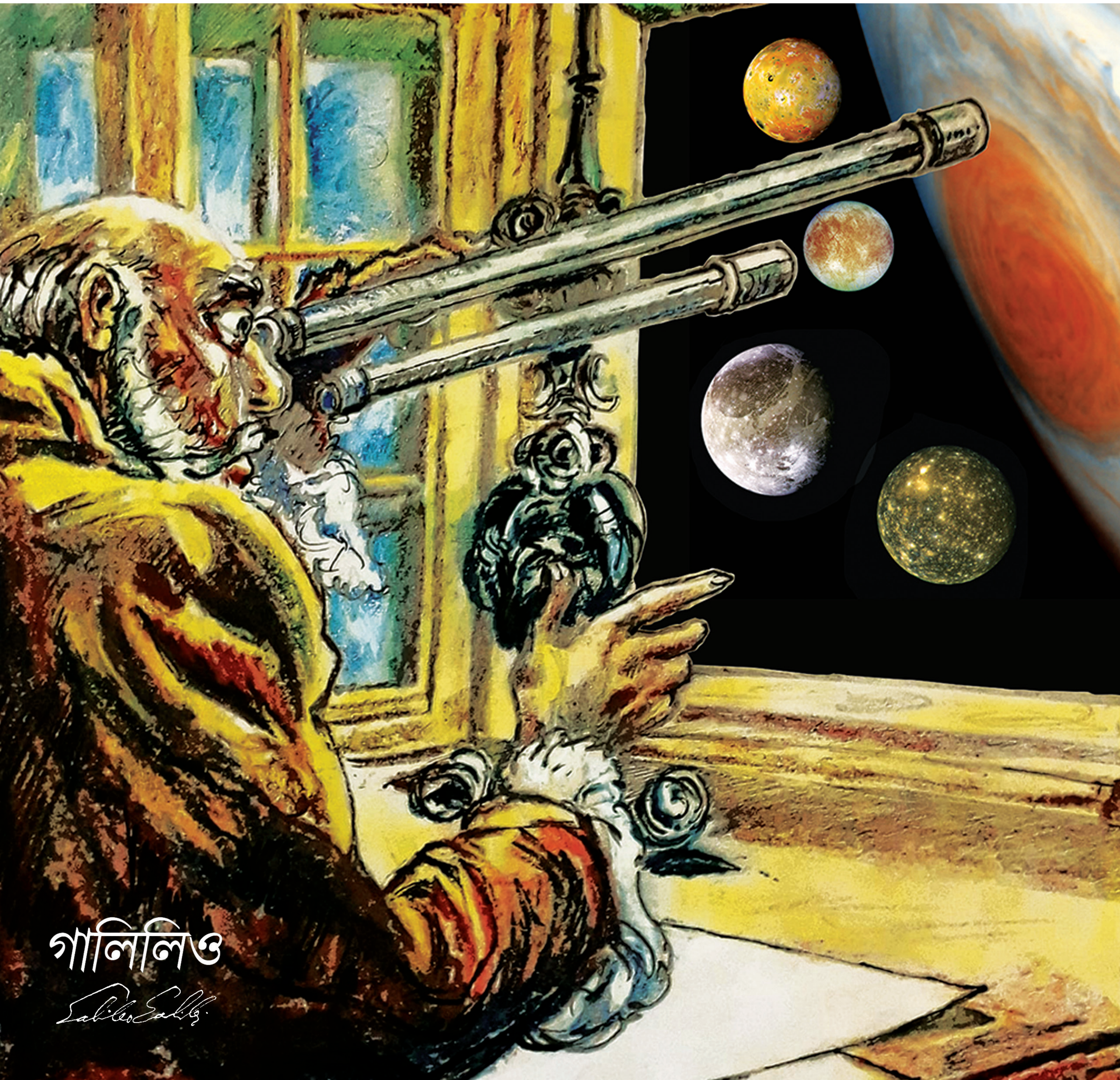

সূচি

১ আমাদের কথা

২ গালিলিও — সত্যেন্দ্রনাথ বসু

৭ সংখ্যার আবিষ্কার — রামজীবন ভৌমিক

৮ অনেক হাত অনেক মাথা — দিগন্ত পাল

১০ আহারে নির্ভার — সৌম্যকান্তি জানা

১৩ বেগুনের কত গুন — সায়ন্তন যশ

১৪ কচ্ছপ দীর্ঘজীবী হয় কেন? — অমিতাভ চক্রবর্তী

১৫ ঈগল নীহারিকা — তন্ময় ধর

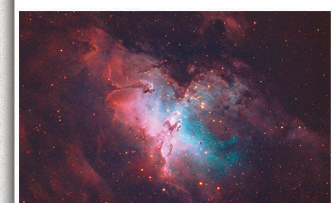

১৬ চা — জয়দেব দে

১৯ রান্নাঘরে তিন্নি — অনিন্দ্য দে

২০ আপেক্ষিক তত্ত্ব — অনিন্দ্য দে

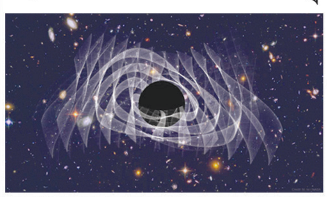

২৪ শব্দের গতিকে হার — কৌশিক রায়

২৬ গরুর মুখে অক্সিজেন? — ভবানীপ্রসাদ সাহু

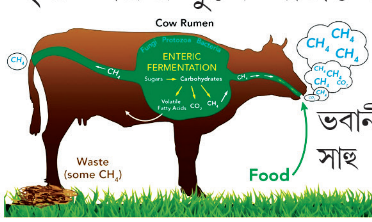

২৭ চুল পাকে কেন — কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮ অন্য ব্রহ্মাণ্ডের উঁকি — তন্ময় ধর

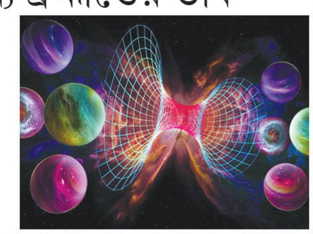

৩০ নিউটনের ক্ষ্যাপামি — অমিতাভ চক্রবর্তী

৩২ সংবাদ

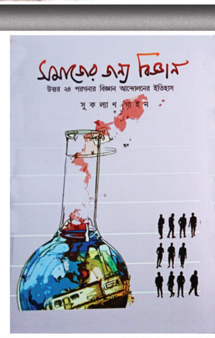

৪র্থ প্রচ্ছদ যারা হারিয়ে যাচ্ছে — রাজা রাউত

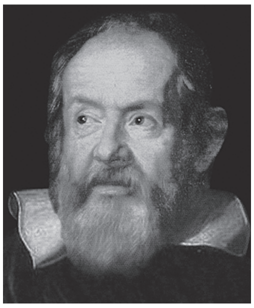

সুভাষিতম্

‘বিশ্বপ্রকৃতি সকল মানুষকে চোখ দিয়েছেন তাঁর ক্রিয়াকলাপ দেখতে ও বুদ্ধি দিয়েছেন যাতে তার মর্মকথা সকলে বুঝতে পারে ও নিজেদের কাজে লাগাতে পারে।’

—গালিলিও

বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক
তাপস মজুমদার

সম্পাদকমণ্ডলী
জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সরদার, জগন্ময় মজুমদার, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, প্রবীর বসু, সৌরভ মুখার্জী

: website :
www.ssu2011.com/bigyan-anneswak
: e-mail :
1.bigyanannesak1993@gmail.com.
: Whatsapp No. :
9874778216 / 9143264159
7980121478

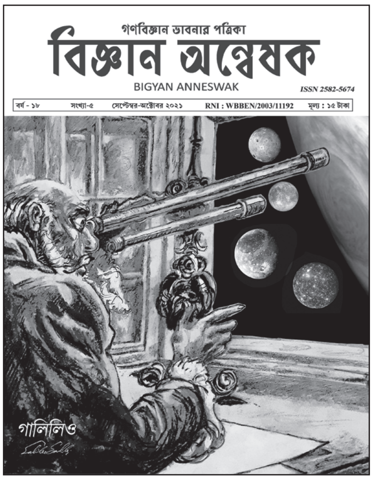

প্রচ্ছদ বিন্যাস অঙ্গসজ্জা
তাপস মজুমদার
প্রচ্ছদ ও অন্যান্য অঙ্কন
সৌরভ মুখার্জী

আমাদের কথা

পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য?

একটা সময় ছিল বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে প্রবন্ধ রচনা আসত—‘বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ’। একটা সময় ছিল যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিজ্ঞানের ‘অশ্বমেধের ঘোড়া’ শিল্প বিপ্লব নিয়ে এল। বিজ্ঞানের জয়ধ্বজা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তখনকার সময়েই এই বিজ্ঞানেরই অন্তিম ফসল—পরমাণু বোমা হিরোশিমা ও নাগাসাকির লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নিমেষে কেড়ে নিল। মানুষকে চমকে দিল। মানুষকে ভাবালো। মানুষ দেখল বিজ্ঞানের মানব বিরোধী প্রয়োগের অন্ধকার দিকটাকেও। তাই আধুনিক যুগে যখন জিন ক্লোনিং করে নতুন নতুন জীব তৈরি করা হচ্ছে, তখন কৃত্রিম মানব শিশু তৈরিতে লাগাম দেওয়া হয়েছে। তাসত্ত্বেও নতুন নতুন মারণ যুদ্ধাস্ত্র ও আরও শক্তিশালী মারণ বোমা তৈরি হয়ে চলেছে। মানবজাতির অস্তিত্ব জীবন মৃত্যুর মাঝে সরু সুতোয় দুলছে। কেউ জানে না কখন কোন মুহূর্তে বা কোন স্থানে তার প্রয়োগ মানুষ নামক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটাবে।

কিন্তু আমরা যখন মানব সংকটের কথা বলছি, অন্য একটি দিকের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হচ্ছি। এই একমাত্র পৃথিবীতে অবস্থিত লক্ষ লক্ষ প্রজাতির অন্যান্য জীবের অস্তিত্বের কথা। বাস্তুতন্ত্রে তাঁদের সঙ্গে মানুষের অস্তিত্বের নিবিড় সম্পর্কের কথা। এই পৃথিবীতে যারা ভালো মানুষ, তারা বলছেন—বিজ্ঞানকে মানুষের উন্নতিতে কাজে লাগাও। অন্যদিকে তথাকথিত খারাপ মানুষের দল তাদের ক্ষমতা, স্বার্থপরতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিজ্ঞানকে বেপরোয়া ব্যবহার করে চলেছেন। সকলেরই চিন্তার কেন্দ্রে শুধুমাত্র মানুষ নামক প্রজাতি। অন্য প্রজাতিদের কথা ভাববে কে? তবু আশ্চর্যের বিষয় এই পৃথিবীতেই অন্ধকার শূন্যতার ও নিরাশার মাঝেও অতি ক্ষীণ আলোর দেখা পাওয়া যায়। অসংখ্য আত্মসর্বস্ব মানবের মাঝে গুটিকয়েক অন্য প্রজাতির প্রতি ভালোবাসায় সিঞ্চিত মানুষও পাওয়া যায়। ওই দেখুন একটি কিশোর ও একটি কিশোরী কলকাতার রাস্তায় মাইক হাতে বলে চলেছেন,

> ‘এখন গরমকাল। এখন পাখিদের খুব তেষ্টা পায়। দয়া করে আপনারা বাড়ির ছাদে অথবা বারান্দায় জল রেখে দেবেন।’

আমরা ভাবছি, আপনারাও ভাবুন।

—তাপস মজুমদার

ISSN 2582-5674
9 772582 567004

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
যোগাযোগ : ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২/৯২৩১৫৪৫১৯১

প্রচ্ছদ কথা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

গালিলিও

(সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম ১ জানুয়ারি ১৮৯৪ ও মৃত্যু ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪। রচনাটি জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এপ্রিল ১৯৬৪ প্রকাশিত)

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৫৬৪ গালিলিও পিসা-তে জন্মেছিলেন। সব দেশের বিজ্ঞানীর কাছে এঁর নাম সুপরিচিত। তাঁর জন্মের চারশ বৎসর পরে আজ সব দেশে সভাসমিতিতে তাঁর কথা ও জীবনীর আলোচনা হচ্ছে।

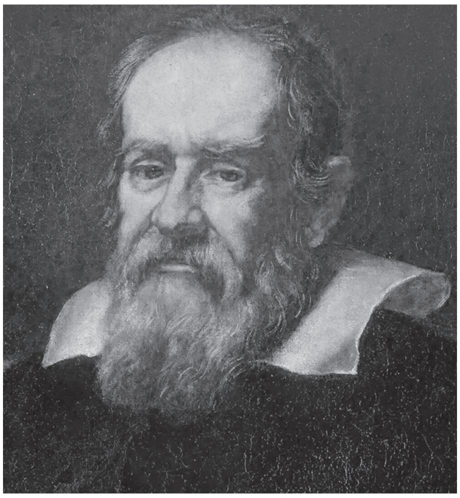

গালিলিও

তাঁর পরিবারের নাম ছিল গালিলাই। পিতা পুরাণ-সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন, তাছাড়া সঙ্গীতে ও গণিতে তাঁর দখল ছিল—নিজে Lute ভাল বাজাতে পারতেন—সঙ্গীত তত্ত্বের উপর বইও লিখেছিলেন কয়েকখানি। প্রথমে ১৩ বৎসরের ছেলে গালিলিও গেলেন Vallam-brosa-র বেনেডিকটিন (Benedictine) সম্প্রদায়ের মঠে। দুই বৎসর ধরে সাহিত্য, ন্যায় ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। তবে শেষ অবধি মঠ ছাড়তে হল। বাপ বললেন ছেলের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, বেশি পড়াশুনা ক্ষতিকর। অবশ্য হয়ত মনে মনে একটু ভয়ও ছিল—ছেলে যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায়—সংসারের দিকে নজর দিতে কেউ থাকবে না তাঁর পরে। সচ্ছল অবস্থা আর নেই তাঁর। সংসারের হতশ্রীকে পুনরুদ্ধার করতে ছেলেকে চেষ্টা করতে হবে। আজ এখন গালিলিওর জীবনের সব কথা জানা দুষ্কর। তবে আমরা জানি, তিনি নিজে খুবই ভালবাসতেন সঙ্গীত ও চিত্রকলা। নিজের ইচ্ছা চালাতে পারলে হয়ত শেষ অবধি চিত্রকর হয়ে পড়তেন। তবে তা হল না। ১৫৮১ সালে সতেরো বৎসরে ঢুকলেন পিসা (Pisa) বিশ্ববিদ্যালয়ে

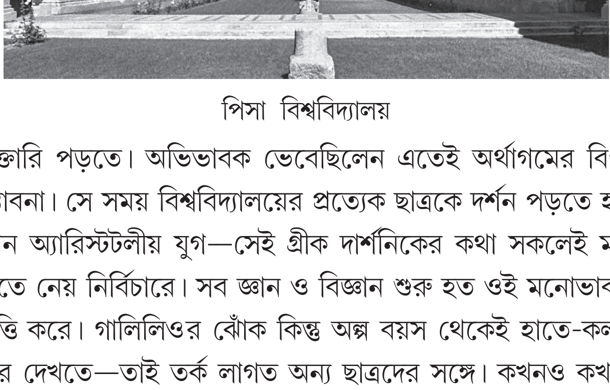

পিসা বিশ্ববিদ্যালয়

ডাক্তারি পড়তে। অভিভাবক ভেবেছিলেন এতেই অর্থাগমের বিপুল সম্ভাবনা। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে দর্শন পড়তে হত। তখন অ্যারিস্টটলীয় যুগ—সেই গ্রীক দার্শনিকের কথা সকলেই মাথা পেতে নেয় নির্বিচারে। সব জ্ঞান ও বিজ্ঞান শুরু হত ওই মনোভাবকে ভিত্তি করে। গালিলিওর ঝোঁক কিন্তু অল্প বয়স থেকেই হাতে-কলমে করে দেখতে—তাই তর্ক লাগত অন্য ছাত্রদের সঙ্গে। কখনও কখনও শিক্ষকদের সঙ্গেও বেধে যেত বাকযুদ্ধ। যুক্তিতর্কের প্রতি প্রবণতা তাঁর সারা জীবনে লক্ষ করবার জিনিস—এই স্বভাবই শেষ জীবনে তাঁর অশেষ দুঃখের কারণ হল। এই কাজ-পাগল কি করে বিশুদ্ধ গণিতের দিকে ঝুঁকল? গল্প এই—পরিবারের এক বন্ধু ছিলেন গণিতশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। তিনি বিখ্যাত ছিলেন সে সময়—সকলে যেত তাঁর কাছে পড়তে। একদিন কোন কাজে গালিলিও এসেছেন তাঁর বাড়িতে। তাসকানীর (Tuscany) শাসকের পুত্র তখন সেই পণ্ডিতের কাছে পড়ছে। কাজেই গালিলিও অনেকক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন, অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সেই গণিতের ব্যাখ্যা। এই থেকে শুরু হল মনের প্রচন্ড পরিবর্তন। সেই থেকে ডাক্তারি পড়ায় আনন্দ পান না। গণিতের অধ্যয়ন বাসনাই প্রবল হয়ে উঠল, গালিলিওর ডাক্তারি পড়া হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি আর পেলেন না। পারিবারিক নানা কারণে গৃহস্থালী ফ্লোরেন্সে (Florence) উঠে এল। বাবার অর্থ সামর্থ নেই ছেলেকে বিদেশে রেখে পড়ান। কাজেই গালিলিও চলে এলেন ফ্লোরেন্সে। এখানে সেই সভাপণ্ডিতের কাছে পড়তে শুরু করলেন—গণিত ও পদার্থবিদ্যা। অদ্ভুত তাঁর অধ্যবসায়। অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষককে ফেলে গেলেন অনেক পেছনে। এই বিদ্যায় ও অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠা এল—নানা দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি এই নিয়ে মেতে আছেন, উদ্ভাবন করছেন নানারকমের যন্ত্র এবং নানারকম পরীক্ষাও শুরু হয়েছে তাদের সাহায্যে। নবীন বিজ্ঞানীকে প্রথমে ভুগতে হয়েছিল অর্থকষ্টের জন্যে। ছেলে পড়িয়ে রোজগারের চেষ্টা ছিল কিন্তু তাতে অল্পই আয় হত সে সময়। তবে ১৫৮৮ সালে দেখি, 'পিসা' বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের শিক্ষকতা করছেন। আয় মাত্র ৬০ Scudi। একজন হিসাব করে বলেছেন—বর্তমানের হিসাবে এটা ৯০০-১০০০ টাকা বাৎসরিক আয়ের সামিল হবে। এতে পরিবারের সব খরচ চালানো দুষ্কর। তখন এদেশের মত ইটালিতে একান্নবর্তী পরিবারের যুগ। বাপ আবার মারা গেলেন ১৫৯১ সালে। গালিলিও হলেন কর্তা। সকলের ভার বইতে হল-মা, দুই বোন। ছোট ভাই মাইকেল এনজেলো (Michael-Angelo) (ইনি বোধহয় গান-বাজনা নিয়েই সময় কাটাতেন) বিদেশে চলে গেলেন এবং পোলান্ডে রাজদরবারে কলাবিদ হলেন। বাড়িতে-ফ্লোরেন্সে রয়ে গেল তাঁর স্ত্রী ও সাতটি ছেলে-মেয়ে। গালিলিওকে তাঁদেরও দেখতে হত। এই জন্য সারা জীবন দেখা যায় গালিলিও একদিকে যেমন মহানুভব, পরের কথা ভাবছেন—অপরদিকে

চাইছেন কি করে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হয়। তার জন্যে করতে চাইছেন ব্যবসা, নানা স্থানে উমেদারী করছেন—ছুটাছুটি করছেন ও কর্মস্থল পরিবর্তন করছেন। যদিও মন তাঁর ফ্লোরেন্সকেই ভালবেসেছিল। সেখানেই তিনি থাকতে চাইতেন সারা জীবন। ফ্লোরেন্সকে যে জানে, সেই বুঝবে তাঁর শিল্পীমন ওই মহিমময়ী নগরীর প্রতি কেন এত বেশি আকৃষ্ট ছিল।

পিতার মৃত্যুর পর সংসারে অনটন বাড়ল। তখন ১৫৯২ সালে এলেন পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভূমি তাসকানি ছেড়ে। এখানেই শুরু

পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়

হল তাঁর প্রকৃত বিজ্ঞানীর জীবন। তবে চাপও পড়ল খুব বেশি—বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা তো আছেই, তাছাড়া দেশ রক্ষার নানা ব্যাপারে পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন। আবার ফ্লোরেন্সকেও ভুলতে পারলেন না। ফ্লোরেন্সে আসতেন প্রতি গ্রীষ্মের ছুটিতে। এখানকার Duke-এর ছেলে Cosmo তাঁর প্রিয় ছাত্র। তাঁর মা আবার বিশ্বাস করতেন ফলিত জ্যোতিষে—রাশিচক্র কেটে ভবিষ্যৎ গণনায়। তাঁর মন জুগিয়ে তাও করতেন গালিলিও সময় সময়। যদিও এতে তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন কিনা বলা শক্ত। নিজে কোপারনিকাসের বিশ্ব বিন্যাসে গভীর বিশ্বাসী। অবশ্য তখনও সর্বত্র টলেমীর যুগ চলছে। ফলিত জ্যোতিষের রাশিচক্র গ্রহনক্ষত্র সবই অচল পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে—এই পরিবেশে গ্রহদের অবস্থান নিয়েই জ্যোতিষের বিচার ও গণনা টলেমীয় পন্থায় করতে হয়। এদিকে গালিলিও নতুন মতবাদ নিয়ে মেতে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাডুয়ায় বক্তৃতা দিচ্ছেন—কোপারনিকাসের মতবাদের পক্ষে। প্রচুর লোক শুনতে আসছে এই সব মনোজ্ঞ বক্তৃতা।

দেখতে দেখতে কেটে গেল ১৮ বৎসর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে। Venice-এর সরকার তাঁর উপর খুশি। ১৬০৪ সনে আরও ৬ বৎসরের মেয়াদ বাড়ল শিক্ষকতার। এই সময় তাঁর বৈপ্লবিক মতবাদের বিপক্ষে কেউ আপত্তি জানাল না।

১৬০৯ সালে ঘটল এক নতুন ব্যাপার—হল্যান্ডে একজন কাচের লেন্স নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি নলের দুপাশে রেখে দেখলেন, দূরের জিনিস এভাবে বড় দেখায়—মনে হয় কাছে এগিয়ে এসেছে। গালিলিওর কাছে এই খবর পৌঁছল। তিনি কাগজে প্ল্যান এঁকে আলোর রেখাপথের বিষয় বিচার করতে লাগলেন। শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হল। তিনিও দূরবীন তৈরি করতে পারলেন—এটি আরও ভাল ও শক্তিশালী হল। হল্যান্ডে লোকটি দেখছিল—সব উল্টো

নিজের তৈরি দূরবীনে আকাশ পর্যবেক্ষণ

দেখায় তাঁর দূরবীনে। গালিলিও করলেন যে যন্ত্র, তার সাহায্যে সব জিনিস যথারীতি অবস্থিত দেখায় উল্টোপাল্টা হয় না। Venice-এ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর কদর বেড়ে গেল। সমুদ্রপথে Venice-এর নৌবাহিনী তখন ঘুরে বেড়ায়, নানা দেশ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে এনে ইউরোপে নানা স্থানে বেচা-কেনা করে—বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। রূপকথার স্বপ্নপুরীর মত তখন Venice শহরের সম্পদ। মধ্যে মধ্যে এর নৌবহরকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হত। আগে থেকে শত্রুকে দেখা গেলে যুদ্ধের প্রস্তুতি যথাসময়ে করা সম্ভব। তাই কর্তৃপক্ষ ভাবলেন—এই দূরবীন সব জাহাজেই বসাতে হবে। গালিলিওর উপর ভার পড়ল—দূরবীন যোগান দেবার। গালিলিও রাজি হলেন—বাড়ি হয়ে উঠল ফ্যাক্টরি কারুশালা। সেখান থেকে প্রচুর দূরবীন বিক্রি হতে লাগল। তৈরির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রেরও নানা উন্নতি হল। নতুনগুলি হল আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এবার গালিলিও পেলেন হাতের মধ্যে বিশ্বসমীক্ষার এক প্রধান যন্ত্র। আকাশের দিকে ফিরিয়ে গালিলিও অনেক নতুন দৃশ্য দেখলেন। তাঁর আগে এসব মানুষের কল্পনার অতীত ছিল। চাঁদের পাহাড়, ছায়াপথের মধ্যে লক্ষ লক্ষ তারার সমাবেশ চোখে ধরা পড়ল, আবার এল নতুন নতুন উপগ্রহের খবর। আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে একটিমাত্র

বৃহস্পতি ও তার ৪টি উপগ্রহ

চন্দ্রমা। গালিলিও দেখলেন বৃহস্পতি গ্রহের ৪টি উপগ্রহ ঘুরছে। তখনকার দিনে ধার্মিক পণ্ডিতেরা এসব বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তাঁরা ভাবলেন—এইভাবে কোপারনিকাসের বিশ্ববিন্যাসের স্বপক্ষে যুক্তি সংগ্রহ করে গালিলিও অন্যায় করছেন। দূরবীনের মধ্যে কোন যাদুর বলে বৃহস্পতির চাঁদের ছবি পড়েছে, যা চোখে দেখা যায় না—তা যন্ত্রে প্রতিপন্ন হলে সেটা যন্ত্রেরই কারসাজি। ধার্মিকেরা মত পরিবর্তন করলেন না ও পাছে তাঁদের বিশ্বাস টলে যায়, এই ভয়ে দূরবীনের ভিতর দিয়ে দেখতেও চাইলেন না। এতে গালিলিওর আমোদ লাগল। একজন উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক, যিনি দূরবীনের ব্যবহার করতে চাননি, কাজেই বৃহস্পতির উপগ্রহে অবিশ্বাসী ছিলেন, মারা গেলেন। সেই সময়ে গালিলিও রহস্য করে বললেন—হয়ত এবার যাবার সময় 'চন্দ্রগুলি' দেখতে পাবেন। গালিলিওর নাম তখন দেশে দেশে অভিনন্দিত হচ্ছে। Venice-এর রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অর্থও পাচ্ছেন প্রচুর। তবে এত কাজের মধ্যে বিজ্ঞানীর অবসর মেলে না। অথচ মাথার মধ্যে অনেক নতুন নতুন কথা ভেসে উঠছে—নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করতে চান কিন্তু সময় পান না একাগ্র মনে এই সব বিষয় ভাবতে। অথচ সংসারে তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই ১৬০৯ সালে যখন Tuscany-র বৃদ্ধ ডিউক মারা গেলেন ও তাঁর ছাত্র Cosmo সেই গদীতে বসলেন, তখন তিনি ভাবলেন হয়ত এঁর কাছে যেতে পারলে তিনি আকাঙ্ক্ষিত অবসর পাবেন নিজের কাজ করতে অথচ অর্থেরও কোন অভাব থাকবে না। তাই ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করতে লাগলেন দরবার করতে নতুন ডিউকের কাছে। এই সময় ফ্লোরেন্সের এক বন্ধুকে লেখা চিঠির থেকে কয়েক লাইনের সারাংশ উদ্ধৃত হল :

"এখান থেকে অন্য কোথাও গেলে যে বেশি অবসর পাবো নিজের কাজ করতে, তা মনে হয় না। কারণ বক্তৃতা দিয়েই পয়সা রোজগার করতে হবে সংসার চালাতে। পাডুয়া ছাড়া অন্য কোন শহরে গিয়ে অধ্যাপনা করতে ইচ্ছাও হয় না নানা কারণে। অথচ অবসর না পেলে কাজও এগোবে না।

ভিনিসে গণতন্ত্র—যতই এরা উদার বা মহানুভব হোক, বাঁধা কর্তব্য করা ছাড়া এদের কাছে বৃত্তি আশা করা বৃথা। যতদিন পারি এই গণতন্ত্রে বক্তৃতা ও লেখাপড়া চালাতে হবে—যা এখানকার লোকেরা চায়। মাইনে পেলে আর অবসর মিলবে না অর্থাৎ যে অবসর ও অর্থানুকূল্য আমি চাইছি, সে কোন এক দেশের স্বতন্ত্র রাজার কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব।"

আবার অন্যত্র লিখেছেন—"রোজ রোজ নানা উদ্ভাবন করা যাচ্ছে। অবসর ও সাহায্য পেলে অনেক বেশি পরীক্ষা ও আবিষ্কার করতে পারব।"

এক বৎসর ধরে এই ধরনের কথাবার্তা চালালেন রাজার বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও কর্মচারীদের সঙ্গে। শেষে ১৬১০ সালে শরৎকালে Tuscany-এর নতুন Grand Duke নিজের পুরনো গুরুকে আশ্রয় দিলেন—১০০০ scudy মাইনে প্রতি বৎসর। তাছাড়া রাজপণ্ডিত ও দার্শনিক হিসাবে স্বর্ণপদকে বিভূষিত হলেন তিনি। পাডুয়া ছেড়ে ফ্লোরেন্সে গেলেন গালিলিও।

এবার বিজ্ঞান সেবার প্রচুর অবসর মিলল। তবে যে সব নতুন কথা বললেন, বিশেষ করে জ্যোতিষের বিষয়, তাতে ইউরোপের পণ্ডিতমহলে হৈচৈ বেঁধে গেল। অনেকে তাঁর বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। তাছাড়া আর এক কারণে তাঁর সব আবিষ্কার ও মতামত শুধু পণ্ডিতমহলে আবদ্ধ রইল না। শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে প্রচারের জন্যে গালিলিও ধরলেন এক নতুন পন্থা। পণ্ডিতীমহলে চালু Latin ছেড়ে লিখতে আরম্ভ করলেন—নিজের আবিষ্কার ও মতবাদ, ইটালিয়ান ভাষায়। ইটালির মধ্যে যাদের অক্ষর পরিচয় হয়েছে, এমন সব লোকই যাতে পড়তে পারে। ১৬১২ সালের মে মাসে তিনি চিঠিতে লিখলেন ঃ

"আমি দেখি যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে—হচ্ছে ডাক্তার, দার্শনিক বা অন্য কিছু—যা হোক একটা উপাধি হলেই হল। তারপর এমন কাজে তারা নামে, যার জন্যে তারা একেবারেই অপটু। এদিকে যারা সত্য-সত্যই উপযুক্ত লোক, তারা কাজের মধ্যে থেকে কিংবা দৈনিক দুশ্চিন্তার মধ্যে আর জ্ঞানের চর্চা করতে পারে না। এরা মেধাবী কিন্তু তাঁরা সাধুভাষা (Latin) ইত্যাদি বোঝে না। তাই সারা জীবন তাঁদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল থেকে যায় যে প্রকান্ড প্রকান্ড বই এমন সব মহামূল্য জ্ঞানের ভান্ডার, যা তাদের কাছে একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে। কিন্তু আমি চাই তাঁদের মধ্যে এই সত্য জ্ঞানের উদ্বোধন করতে যে, বিশ্বপ্রকৃতি সকল মানুষকে চোখ দিয়েছেন তাঁর ক্রিয়াকলাপ দেখতে ও বুদ্ধি দিয়েছেন যাতে তার মর্মকথা সকলে বুঝতে পারে ও নিজেদের কাজে লাগাতে পারে।"

নিজের দূরবীন নিয়ে গালিলিও অনেক নতুন আবিষ্কার করলেন।

চাঁদের পর্বতমালা, বৃহস্পতির উপগ্রহসমূহ, সূর্যবিম্বে কলঙ্কবিন্দু, শুক্র গ্রহের চন্দ্রের মত ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি, শনির বলয় ইত্যাদি আরও অনেক জিনিস। এই ভাবে নিজের চোখে গ্রহমন্ডলের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলেন, যার সত্যতা যে কেউ দূরবীনের সাহায্যে নিরূপণ করতে পারবে। কোপারনিকাসের মতবাদ তাঁর কাছে অভ্রান্ত মনে হল।

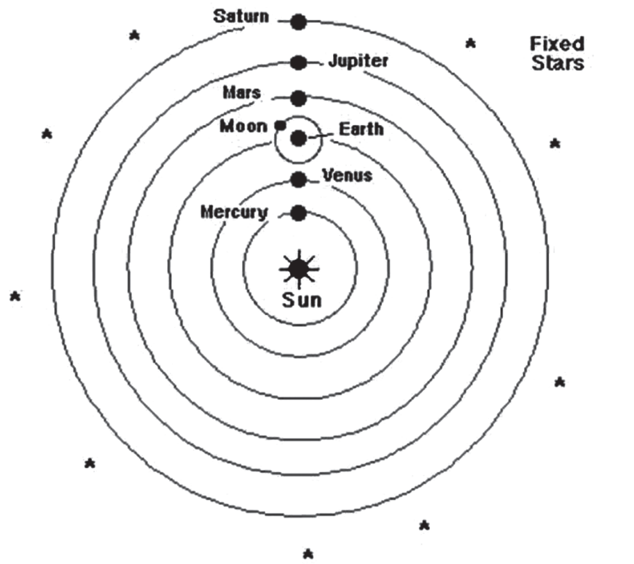

কোপারনিকাসের মতে সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে থাকে সূর্য (পৃথিবী নয়)

যুক্তিবাদী গালিলিও ভাবলেন, এই সব কথা প্রকাশ করলে সকলকেই তাঁর স্বপক্ষে আনতে পারবেন। তাই সে বিষয়ে বইও লিখলেন তিনি। তা সত্ত্বেও সনাতনীরা কিন্তু তার বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। একদিকে ফ্লোরেন্সের ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অধ্যাপক ও ছাত্রেরা, যাঁরা এই সব নতুন মত মানতে পারতেন না কিংবা যাঁরা তাঁর যশোপ্রতিভায় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। প্রথম প্রথম গালিলিও তাঁর সহকর্মীদের মনোভাব নিয়ে অনেক ঠাট্টা-তামাসা করতেন, এতে তাদের বিদ্বেষ আরও বাড়ল। ধর্মযাজকেরা প্রচার করতে লাগলেন যে, গালিলিওর অধ্যাপনা ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী, বাইবেলের অনেক কথার সরাসরি বিরুদ্ধে। তাঁরা গোপনে অভিযোগ করলেন—গালিলিও ধর্ম-বিদ্বেষ প্রচার করছেন; বাইবেলের উপর মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করতে চাইছেন।

তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গোপনে কাজ আরম্ভ করল। প্রথমে Inquisition রায় দিলেন যে, সূর্য যে জগতের কেন্দ্রস্বরূপ—এটি অযৌক্তিক এবং যথার্থ ধর্মমতের পরিপন্থী—কারণ এই মত বাইবেলের অনেক লেখার সঙ্গে মিলবে না, যা এতকাল ধার্মিক যাজক ও পণ্ডিতেরা শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও প্রকাশ করলেন—পৃথিবীর আহ্নিক বা বার্ষিক গতির ধারণা প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী। ১৬১৬ সালে মার্চ মাসে কোপারনিকাসের বই ও তৎসম্পর্কিত আরও দুইটি বইয়ের প্রচার তাঁরা নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং পুণ্যাত্মা পোপের কাছে এই খবর পৌঁছে দিলেন।

পোপ আদেশ দিলেন কার্ডিনাল বেলারিমিন যেন গালিলিওকে

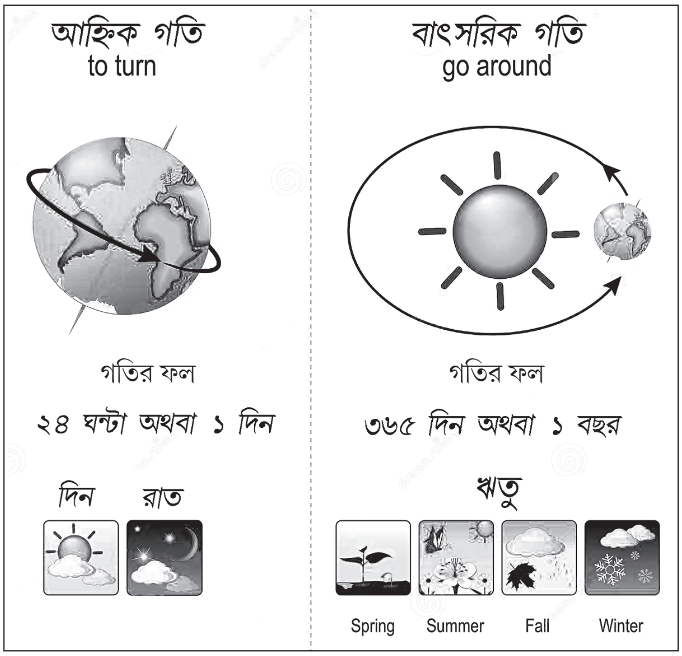

আহ্নিক বা বার্ষিক গতির ফলে দিন-রাত ঋতুর প্রকাশ

ডেকে বুঝিয়ে বলেন—তিনি যেন এই ভ্রান্তবিশ্বাস ত্যাগ করেন, আর তা যদি তিনি না করতে চান তো বিধিমত তাঁকে আদেশ দেওয়া হবে, যাতে তিনি এই মত প্রচার বা আলোচনা বন্ধ করেন। যদি তাতে তিনি অস্বীকৃত হন তো তাকে কারারুদ্ধ করা হবে। ১৬১৬ সালে গালিলিওর রোমে ডাক পড়ল। বেলারিমি ছিলেন গালিলিওর হিতাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ। জ্যোতিষশাস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য আবিষ্কারে গালিলিও তখন নাম করেছেন। জলে ভাসমান বস্তুর স্থিতিসাম্যের বিষয়ে ভাবছেন। আবার গতি-বিজ্ঞানে অনেক নতুন কথাও তিনি বলতে আরম্ভ করেছেন, সেই সময় থেকেই। তাই কার্ডিন্যাল বেলারিমিন ডেকে আনলেন গালিলিওকে নিজের প্রাসাদে। বুঝিয়ে বললেন—কোপারনিকাসের তত্ত্ব নিয়ে তিনি যেন ধর্মপ্রচারকদের

রবার্ট বেলারিমিন

সঙ্গে তর্ক না করেন বা বাইবেল থেকে লাইন উদ্ধৃত করে নিজের মতই তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা না করেন। গালিলিও রাজি হলেন, তবে তিনি ভাবলেন এখনো গণিতের কল্পনা হিসাবে হয়ত কোপারনিকাসের কথা আলোচনা করা যাবে কিংবা যুক্তিতর্ক দিয়ে টলেমী ও কোপারনিকাসের বিশ্ববিন্যাসের গুণাগুণ আলোচনা চলতে পারবে। তাই তারপরও তিনি যেমন অন্যান্য বিজ্ঞানের বই লিখলেন, গতির কথা বা ভাসমান বস্তুর স্থিতিরহস্য—সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথনের আকারে দুই মতবাদের আলোচনা করে বই লিখে ছাপাবার অনুমতি

চাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে। পোপ ও বেলারিমিন মারা গিয়েছেন। নতুন আর একজন পোপের পদে অধিষ্ঠিত। এক সময়ে গালিলিও ভাবতেন—ইনি বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করেন, তাই ভেবেছিলেন নতুন বই প্রকাশে অনুমতি মিলবে। কিন্তু হল হিতে বিপরীত, নানা কারণে তিনি নতুন পোপের বিরাগভাজন হয়েছেন। তাঁর বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। শেষে গালিলিওর ডাক পড়ল—১২ এপ্রিল তিনি কারারুদ্ধ হলেন। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ৩০ এপ্রিল গালিলিওকে স্বীকার করানো হল যে, যা কিছু তিনি এই বিষয়ে কথোপকথনের ছলে লিখেছেন—সে সবই তাঁর বৃথা গর্বের অজ্ঞতা ও অসতর্কতার নিদর্শন। তাঁর নির্যাতনের এইখানেই শেষ হল না। তাঁর মুখ দিয়ে বলানো হল যে, তিনি কোপারনিকাসের মতে বিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিচারকদের সামনে অনুতাপব্যঞ্জক সাদা পোষাক পরে তিনি হাঁটু গেড়ে রইলেন। বিচারকেরা বললেন—"তোমার ভুল দেশের ভয়ানক অমঙ্গল করেছে। তার শাস্তি তোমায় পেতে হবে, তোমার বই নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হবে। আমাদের আদেশে তোমাকে কারারুদ্ধ থাকতে হবে যতদিন আমরা তোমাকে রাখতে চাই, তাছাড়া তিন বৎসর ধরে প্রতি সপ্তাহে তোমাকে অনুতাপসূচক প্রার্থনা করতে হবে।" এর দুদিন বাদে Inquisition তাঁকে ফ্লোরেন্সের দূতাবাসে প্রেরণ করলেন। প্রথমে তাঁকে সিয়েনাতে (Siana) Archbishop-এর নজরবন্দি করে রাখা হল। তারপর ফ্লোরেন্সের শহরতলিতে নিজের গৃহে অন্তরীন রইলেন।

দুঃখে-কষ্টে গালিলিওর জীবনের শেষ ৯ বৎসর কাটল। তখনও বিজ্ঞানের নতুন কথা ভাবতে চেষ্টা করতেন বটে কিন্তু জীবন বিস্বাদ হয়ে গেছে। যে মেয়ে তাঁর পরিচর্যা করত এই দুঃখকষ্টের মধ্যে সেও মারা গেল। নিজে অন্ধ হয়ে যেতে বসলেন। শেষের পাঁচ বৎসর একটু বন্ধন ঢিলে হল—কিছুটা বাধানিষেধের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন পোপের করুণায়—নানা দেশ থেকে তখন তাঁকে দেখতে আসত, তাঁর বই ও লেখা অবৈধ ভাবে অন্য দেশে চালান ও ছাপা হয়েছে। খ্যাতি ও সহানুভূতি ছিল সেই খ্রিস্টিয় মহলে, যাঁরা রোমান ক্যাথলিক ধর্মপন্থী ছিলেন না। সর্বশেষে ৮ জানুয়ারি ১৬৪২ সালে ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করলেন।

প্রবাদ আছে যে, Inquisition বিচারকদের সামনে হাঁটু-গাড়া থেকে যখন তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন—তখন নাকি তিনি বলেছিলেন—"এ সত্ত্বেও পৃথিবী চলমান।" কিন্তু এটা হয়ত গল্প কথা। সনাতনী ধার্মিকেরা বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন যথারীতি। ফলে ইটালি দেশই পিছিয়ে পড়ল। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশে গালিলিওর আজন্ম সাধনা সুফল প্রসব করল।

গালিলিও প্রথমে সনাতনী ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য প্রচার করতে চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন নিজে পরীক্ষা, বিচার ও যাচাই করে নিতে হবে সব সত্যকে—শুধু আপ্তবাক্যকে বিশ্বাস করে জীবনকে গড়ে তুললে ভুল হবে। ফলে তিনি কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার যাঁতায় গুঁড়ো হয়ে গেলেন। তবে মানুষের অগ্রগতি স্তব্ধ রইল না।

চার শত বৎসর বাদেও তাঁর প্রতি নানা লোকের ভক্তির অর্ঘ্য, সেই সত্যের জয় ঘোষণা করছে। 'সত্যমেব জয়তে'।

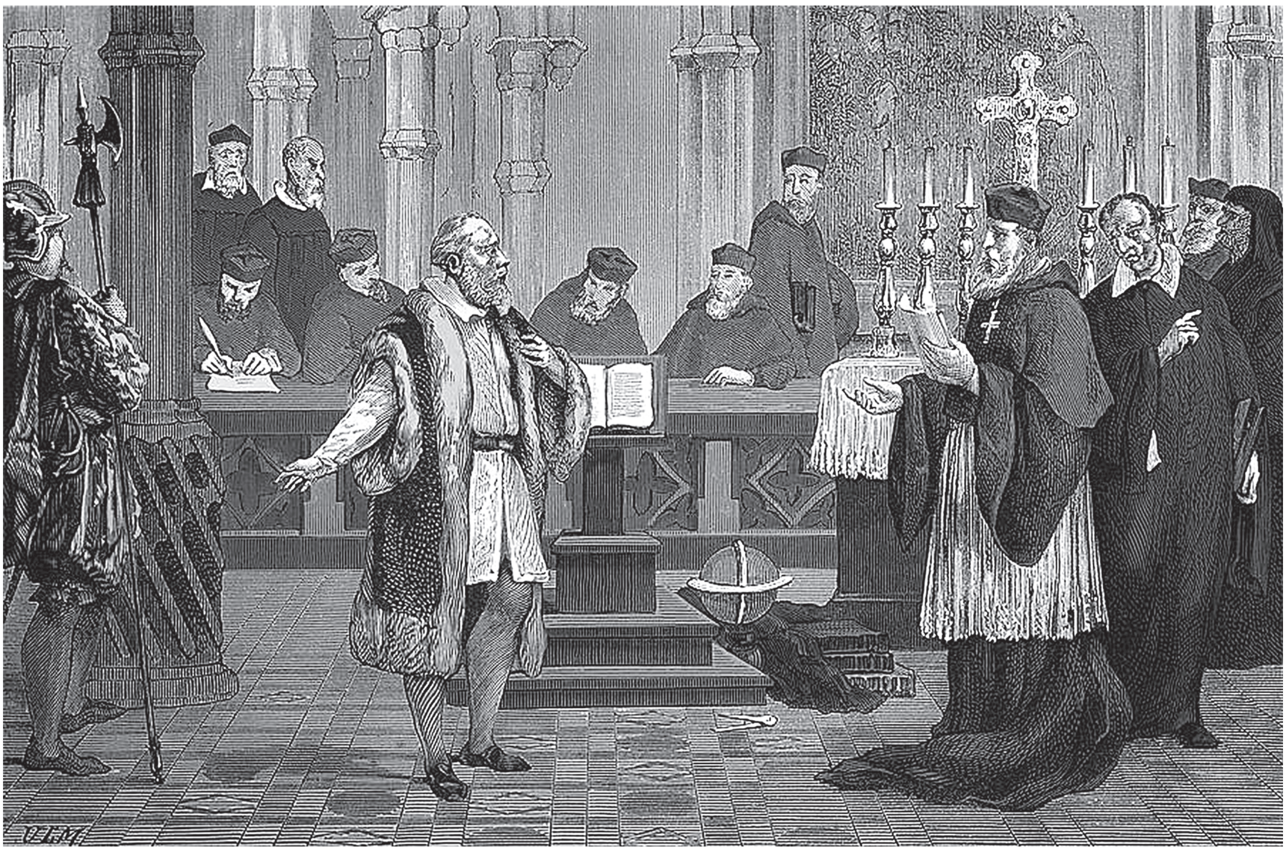

গালিলিওর বিচার চলছে

রা ম জী ব ন ভৌ মি ক

সংখ্যার আবিষ্কার ও গণিতের উন্মেষ

সংখ্যা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে গণিতের উন্মেষ পর্ব। এই পর্ব নিঃসন্দেহে দীর্ঘ এক সময় জুড়ে চলেছে। সেটা রোমাঞ্চে ভরা ঘাত-প্রতিঘাতের অনিঃশেষ সারণি। কালের ঘন অন্ধকারে সে রোমাঞ্চ সারণী ঢাকা পড়ে আছে। গল্প ফেঁদে গণিতের সৃষ্টি ভাবনাকে অনেকেই ধরেছেন। গণিত বা বিজ্ঞানের আলোচনায় নিছক বিশ্বাসে বস্তু মেলে না। সংখ্যা ভাবনার পুরো অগ্রগতি, যুক্তিপ্রমাণ পরীক্ষা ও নানান প্রশ্ন সহ্য করে এগিয়েছে। প্রশ্ন বা পরীক্ষায় অসহিষ্ণু হয়ে পড়লে সেটা অন্য কিছু হয়ে যেতে পারে, বিজ্ঞান বা গণিত থাকে না। চলুন সংখ্যার উন্মেষ পর্বের একটা গল্প ভাবি।

কোথাও মলিনতা নেই। আকাশ রকমারি মেঘ আর বিহঙ্গ কূজনে মুখরিত। সবে মানুষ পশুপালন শিখেছে। কৃষিকাজ জানা এখনো দূর অস্ত। প্রকৃতি পশুচারণ এর জন্য বিস্তৃত ভূখণ্ড সবুজ গালিচায় সাজিয়ে রেখেছে। ধরুন এই সময় দুটি গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্ব বাধল। এর সামান্য কারণ। এক গোষ্ঠীর সীমানা চত্বরে অপর গোষ্ঠীর কোন সদস্য ঢুকে পড়ে কিছু পশু নিয়ে গেছে। আলাপ-আলোচনার জন্য বেশ কিছুদিন সময় গেল। সমস্যা মিটল না। ধীরে ধীরে সমস্যাটা চরম শত্রুতায় গিয়ে ঠেকল। শুরু হল যুদ্ধ। আগে যখন মানুষ পশুপালন শেখেনি তখন যুদ্ধের রীতি ছিল চরম নৃশংস। দুটি বিবদমান গোষ্ঠীর যে কোন একটি পক্ষের শেষ সদস্যকে মেরে না ফেলা অবধি যুদ্ধ চলত। জীবিত রাখা মানেই নিজেদের অপ্রতুল শিকার করা খাদ্যভাণ্ডারে ভাগ বসতে দেওয়া। নিজেদের অস্তিত্বের সংকট নিজেরাই ডেকে আনা। কিন্তু এখন সময় বদলে গেছে। পশু শিকারের পাশাপাশি মানুষ পশুপালনেও মনোযোগী হয়েছে। যুদ্ধের অপর গোষ্ঠীর সব মানুষদের মেরে না ফেলে কিছু সদস্যকে বন্দি করার ব্যবস্থা হল। পাওয়া গেল দাস গোষ্ঠী। পশু চারণের বা পশুর প্রতিপালনের বিভিন্ন স্তরের কাজে লাগানোর জন্য প্রচুর মানবসম্পদ দরকার। দাসদের প্রতিপালনের বিপুলভাবে কাজে লাগানোর কথা ভাবা হল। বিজয়ী গোষ্ঠীর মানুষদের হাতে অফুরন্ত ফুরসৎ মিলল। এইবার এই বিজয়ী গোষ্ঠীর কাজ হল পশুপালন বিদ্যায় মনোনিবেশ করা। কত সংখ্যক পশু চারণভূমিতে গেল আর কত ফিরে এল? না, সংখ্যাগত স্পষ্টতায় এ প্রশ্ন আসেনি। গোয়ালের মেঝেতে ঠাসাঠাসি পশু রাখা হয়েছিল। আজ বুঝি মেঝের কিছুটা জায়গা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। আগামীকাল আরো ফাঁকা ফাঁকা! নিশ্চয়ই পশু কমছে। কেন কমছে পশু? কত কমছে? ধীরে ধীরে প্রশ্নটা স্পষ্টরূপ দাবি করল। প্রথমে বিজিত ও বিজয়ী গোষ্ঠীর মধ্যে কাজিয়া শুরু হল। দাসরা বোঝাতে চাইল তারা তাদের দায়িত্ব ঠিকই পালন করছে। বিজয় গোষ্ঠীর মনে সন্দেহ, কালকের স্বাধীন মানুষ আজ সে দাস। তারাই ইচ্ছে করে ক্ষতিটা করছে কি? মালিক গোষ্ঠীর মনে রকমারি প্রশ্ন জাগল। তারা বিভিন্ন দিক থেকে কারণ পরখ করে দেখতে শুরু করল। মালিকরা লক্ষ করল দাসদের ভেতর অনেক ক্ষোভ বিক্ষোভ আছে। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে এখনও কোনো ষড়যন্ত্র নেই। সমস্যাটা কি? অনেক ভেবে একটা ভাবনা সবাই স্পষ্ট করে বুঝতে চাইল। কত পশু চারণভূমিতে গেল আর কত পশু ফিরে এল—এর একটা গোনাগুনতি হিসেব চাই। দাসসের দিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক পশু চারণভূমিতে পাঠাতে হবে। ছোট ছোট পশুযুথ করতে হবে। দাসদের পশু সংখ্যায় দায়বদ্ধ করতে গেলে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা ধারণার সাধারণ ভাবনা দরকার। দাস মালিকদের দীর্ঘ আলোচনা হল। ঠিক হল একটা করে পশু আস্তানার বাইরে যাবে আর পশুচারণের দায়িত্ব প্রাপ্ত দাস একটি করে নুড়িপাথর এক জায়গায় জমা করবে। এভাবে তার পশুযুথ যখন আস্তানা থেকে পুরো বাইরে বেরিয়ে এল, পেছনে একটা নুড়িপাথরের ছোট স্তূপ পড়ে রইল। একাধিক পশুযুথ নুড়িপাথরের ছোট ছোট স্তূপ রেখে চারণভূমিতে চরতে গেল। সন্ধ্যায় ফিরে আসার পর ঠিক বিপরীত পদ্ধতি। এক-একটা করে নুড়িপাথর সরিয়ে একটি একটি করে পশু আস্তানাতে প্রবেশ করানো হল। একদিন সন্ধ্যায় পরিস্থিতি অন্যদিনের মতন একরকম হল না। নুড়িপাথর সরিয়ে পশু আস্তানায় প্রবেশ করানোর পরও কিছু নুড়িপাথর পড়ে রইল। দাস ও মালিক গোষ্ঠী উভয়েরই বুঝতে বাকি রইল না যে কিছু সংখ্যক পশু আজ ঘরে ফেরেনি। আজ মালিক গোষ্ঠী সহজে জিজ্ঞাসা করল কত পশু হারিয়েছে? দাসগণ হাতে মুঠি মুঠি পাথর নিয়ে দুই বাহু প্রসারিত করে নিশ্চুপ অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইল। মালিক গোষ্ঠী অস্ফুটে বলল, এত মুঠি নুড়িপাথরের পশু হারিয়েছে? তারা দাসদের মুঠির পাথরগুলোকে এক জায়গায় স্তূপ করে রাখতে বললেন। আবার অবাক, এত বড় পাথর স্তূপের পশু নেই? আগে একই সমস্যায় প্রশ্নটা সংখ্যাগতভাবে দানা বাঁধত না। পশু আস্তানার মেঝের ক্ষেত্রফল শূন্যতা দিয়ে আন্দাজ করা যেত মাত্র। আজ হয়ত ছোট ছোট শিশুও পাথর গুণে বলে দিতে পারবে ঠিক কত পশু নেই। কিন্তু সেদিন ১, ২, ৩... করে নির্দিষ্ট সংখ্যায় পৌঁছানো যায়নি। কিন্তু সমতুল্যতা সম্বন্ধের মাধ্যমে সমস্যাটা নির্দিষ্ট হল।

email:@gmail.com • M. 9933188054

দি গ ন্ত পা ল

অনেক হাত অনেক মাথা

মানুষের দুটি মাত্র হাত ও একটিই মাথা আছে। কিন্তু এর বেশি হাত বা মাথা যুক্ত মানুষের ভাবনা বা কল্পনার কি সত্যিই কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে? আছে বই কি! আসুন বোঝাই। তবে এই বিষয়টি বোঝার জন্য প্রথমে আমরা ধারণা করে নেব সেই সকল ঘটনাগুলি সম্পর্কে যেগুলি সন্তান প্রসবের আগে স্রষ্টা-নারীর শরীরে ঘটে থাকে—কিছু ঘটনা স্বাভাবিক আর কিছু ব্যতিক্রমী, তবে তারাই সামগ্রিকভাবে রচনা করে আমাদের সার্বজনীন ইতিহাস।

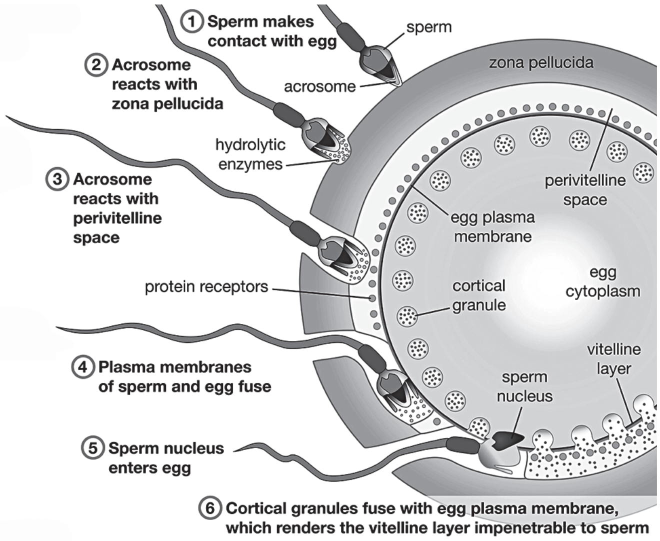

নিষেক

নারীর শরীরে কোন ডিম্বাণু (এগ) পরিণত হলেই তা ডিম্বাশয় (ওভারি) থেকে নির্গত হয়ে গর্ভনালীর (ফ্যালোপিয়ান টিউব) মধ্য দিয়ে জরায়ুর (ইউটেরাস) উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। গর্ভনালীতে এই যাত্রাপথেই ডিম্বাণু পুরুষ প্রদত্ত শুক্রাণু (স্পার্ম)-র সংস্পর্শে আসে। শুক্রাণু, ডিম্বাণুর পর পর তিনটি বহিরাবরণ অর্থাৎ “কোরোনা রেডিয়াটা”, “জোনা পেলুসিডা”, ও “প্লাজমা পর্দা” ভেদ করে ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং “নিষেক” (ফার্টিলাইজেশন) প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটায়। এরপর শুক্রাণুর মধ্যে থাকা জেনেটিক তথ্য বহনকারী ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খলগুলি আর ক্রোমোজোম-এর আকারে গুটিয়ে না থেকে ডিম্বাণুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ডিম্বাণুর মধ্যেই এই ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খলগুলিকে ঘিরে একটি নতুন আবরণ তৈরি হওয়া শুরু হয় আর তখনই শৃঙ্খলগুলিও আবার গুটিয়ে ক্রোমোজোম-এর আকার নিতে শুরু করে। এরকম মোট তেইশটি ক্রোমোজোম এই নতুন আবরণে আবৃত হয়ে একটি “প্রোনিউক্লিয়াস”-এ পরিণত হয়। আবার ডিম্বাণুর নিজস্ব তেইশটি ক্রোমোজোমকে নিয়ে আরও একটি প্রোনিউক্লিয়াস তৈরি হয়। ডিম্বাণুর মধ্যে এই দুটি প্রোনিউক্লিয়াস একে অপরের সাথে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে নিষেক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

এরপর নিষিক্ত ডিম্বাণু জরায়ুতে পৌঁছে জরায়ুর দেওয়ালে থাকা মিউকাস পর্দা (এন্ডোমিট্রিয়াম)-এ যুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে “ইমপ্ল্যান্টেশন” বা “রোপণ” বলে। ইমপ্ল্যান্টেশন প্রক্রিয়াটি সফল হলে তবেই নিষিক্ত ডিম্বাণুতে পরবর্তী পরিবর্তনগুলো শুরু হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণুটি প্রধানত তিনটি দশার মধ্য দিয়ে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে একটি শিশুর রূপ নেয়। একটি নিষিক্ত ডিম্বাণুর শিশুতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠার এই ঘটনা “এমব্রিয়োজেনেসিস” নামে পরিচিত।

ইমপ্ল্যান্টেশন-এর পর প্রথম সপ্তাহটা নিষিক্ত ডিম্বাণুটি “জাইগোট” অথবা “আদি ভ্রূণকোষ” নামে পরিচিত। এরপর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অষ্টম সপ্তাহ পর্যন্ত এর নাম “এমব্রিয়ো” বা “প্রাথমিক ভ্রূণ”। অষ্টম সপ্তাহের পর শুরু হয় “ফিটাস” বা “ভ্রূণ” দশা।

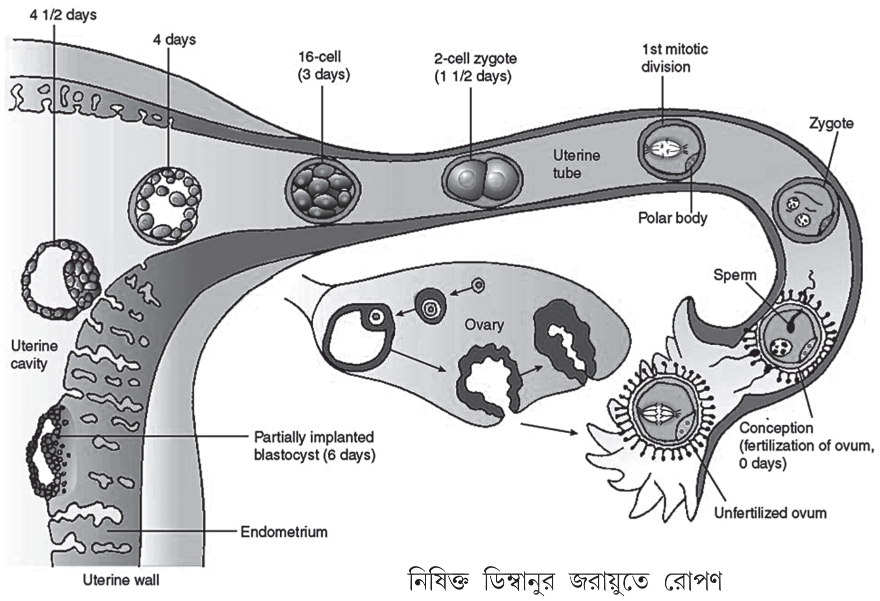

নিষিক্ত ডিম্বাণুর জরায়ুতে রোপণ

নিষিক্ত ডিম্বাণুর "এমব্রিয়ো" দশার শুরুর দিকেই অর্থাৎ নিষেকের আট থেকে বারো দিনের মধ্যেই সাধারণত ডিম্বাণুটি থেকে অজাত শিশুটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তৈরি হতে শুরু করে দেয়। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তৈরি হতে শুরু করার অব্যবহিত পূর্বেই নিষিক্ত ডিম্বাণুটি দুই বা তারও বেশি খন্ডে বিভক্ত হয়ে গেল। এক্ষেত্রে ডিম্বাণুর খন্ডগুলো একে অপরের থেকে স্বাধীনভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং এক একটি খন্ড সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ এক একটি শিশুর রূপ নেয়। ফলে একটির বদলে একাধিক শিশুকে একই সাথে জন্মগ্রহণ করতে দেখা যায়। একই নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে জন্ম হয় বলে এই শিশুদের লিঙ্গ সাধারণত একই হয় এবং অন্যান্য বহু জিনগত বৈশিষ্ট্য একই রকম হয়ে থাকে। এরা জিনগতভাবে যতটুকু ভিন্ন হয় তার প্রধান কারণ হল এই যে, নিষিক্ত ডিম্বাণুর খন্ডগুলো পরস্পরের থেকে স্বাধীনভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। যদি এইভাবে দুটি শিশু জন্মায় তাদেরকে বলা হয় "আইডেন্টিকাল ট্যুইন্স", এই একইভাবে জন্মানো তিনটি শিশুকে বলে "আইডেন্টিকাল ট্রিপ্লেটস্", এমন চারটি শিশুকে একসাথে বলি "আইডেন্টিকাল কোয়াডরুপ্লেটস্" এবং পাঁচটি শিশু জন্মালে তাদেরকে আমরা বলি "আইডেন্টিকাল কুইন্টিউপ্লিটস্" ইত্যাদি।

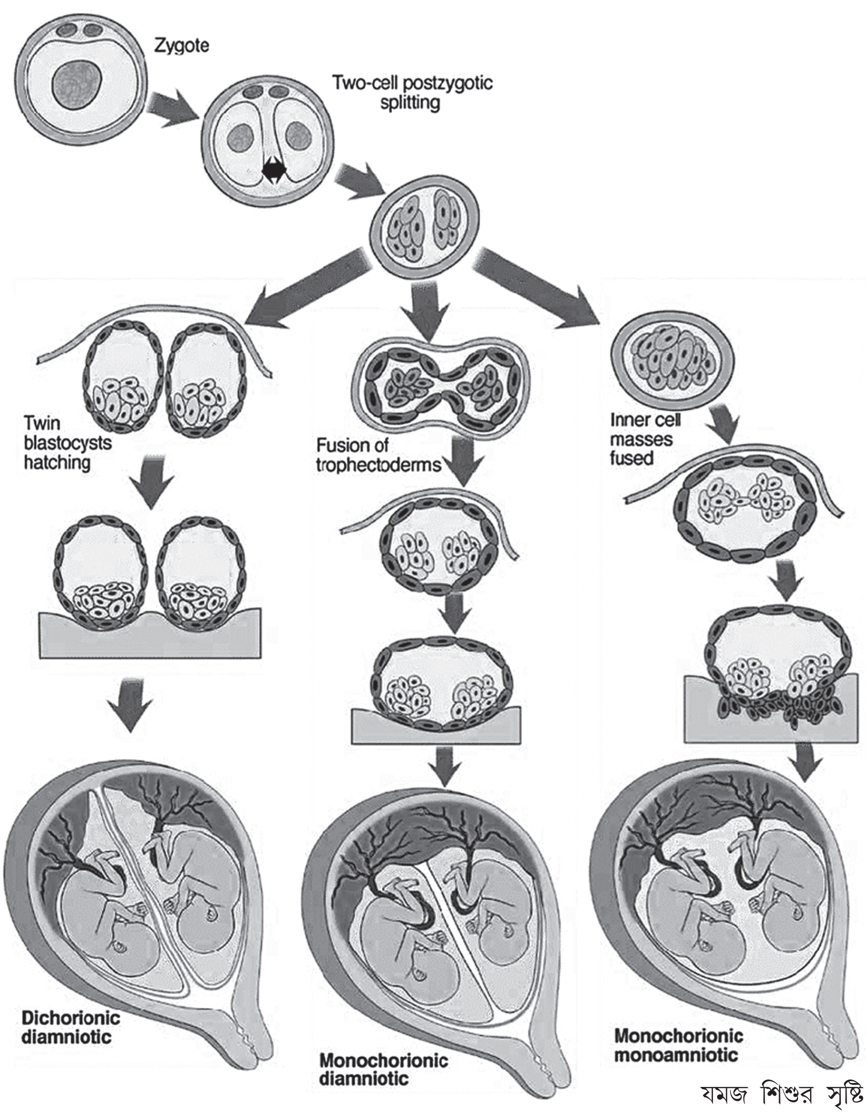

যমজ শিশুর সৃষ্টি

বিরল হলেও কখনও কখনও এমন ঘটে যখন নিষিক্ত ডিম্বাণুর খন্ডে বিভক্ত হওয়ার ঘটনাটি বেশ দেরি করে ঘটে অর্থাৎ ঘটনাটি যখন ঘটে, ডিম্বাণুটি থেকে ইতিমধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি হওয়া শুরু হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ডিম্বাণুটি খন্ডিত হতে শুরু করলেও তা পুরোপুরি খন্ডিত হয় না। এই ঘটনাটি "ফিশন" বা "বিদারণ" নামে খ্যাত। খুব একটা সমর্থন না পেলেও এই প্রসঙ্গে আরেকটি তত্ত্ব প্রস্তাবিত হয়েছিল যার ভিত্তি হল "ফিউশন" বা "একীভবন"। ঐ তত্ত্বানুসারে নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি হতে শুরু হওয়ার পর ডিম্বাণুটি খন্ডিত হতে শুরু করলে ডিম্বাণুটি পুরোপুরি দুই বা ততোধিক খন্ডে বিভক্ত হয় ঠিকই কিন্তু খন্ডগুলির মধ্যে একটিতে উপস্থিত কিছু স্টেম কোষ আরেকটি খন্ডের অনুরূপ কিছু স্টেম কোষের সাথে জটলা পাকানোর প্রবণতা দেখায়, যার ফলে খন্ডগুলি আবার একে অপরের সাথে আংশিকভাবে জুড়ে যায়। "ফিশন" বা "ফিউশন" যাই সত্য হোক না কেন, এরপর ডিম্বাণুটির খন্ডগুলো একে অপরের সাথে আংশিকভাবে জুড়ে থাকা অবস্থাতেই ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে। জুড়ে থাকার জন্য একটি খন্ডের পরিবর্তন আরেকটি খন্ডের পরিবর্তনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে—যেমন কখনও কখনও একটি খন্ডের স্বাভাবিক ক্রম-পরিবর্তন আরেকটি খন্ডের স্বাভাবিক ক্রম-পরিবর্তনে বাধা সৃষ্টি করে। পরিশেষে যখন শিশুর জন্ম হয়, তা সকলের বিস্ময়ের কারণ হয়ে ওঠে কারণ এক্ষেত্রে একাধিক শিশু একে অপরের সাথে জুড়ে থাকা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। এদেরকে "কনজয়েন্ড বেবিস্" অথবা "সংযুক্ত শিশু" বলে। এই বিস্ময়ের মাত্রা আরেক কাঠি বেড়ে যায় যদি দেখা যায় যে জুড়ে থাকা শিশুগুলির মধ্যে কেউ কেউ পূর্ণাঙ্গই হয়নি! "কনজয়েন্ড বেবিস্" জন্মানোর বেশ কয়েকটা এমন ঘটনা প্রচার পেয়েছে যেখানে জুড়ে থাকা শিশুগুলির মধ্যে একটি মাত্র শিশু পূর্ণাঙ্গ আর বাকি শিশুগুলির ধড় বা মাথা কিছুই তৈরি হয়নি, শুধু তাদের হাত পা-গুলি তৈরি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ডাক্তারি শাস্ত্রে এই ধরনের শিশুরা "অসম সংযুক্ত শিশু" বা "অ্যাসিমেট্রিক কনজয়েন্ড বেবিস্" বলে পরিচিত হয়।

email: digantapaul5@gmail.com • M. 9874556152

সৌম্যকান্তি জানা

আহারে নির্ভার

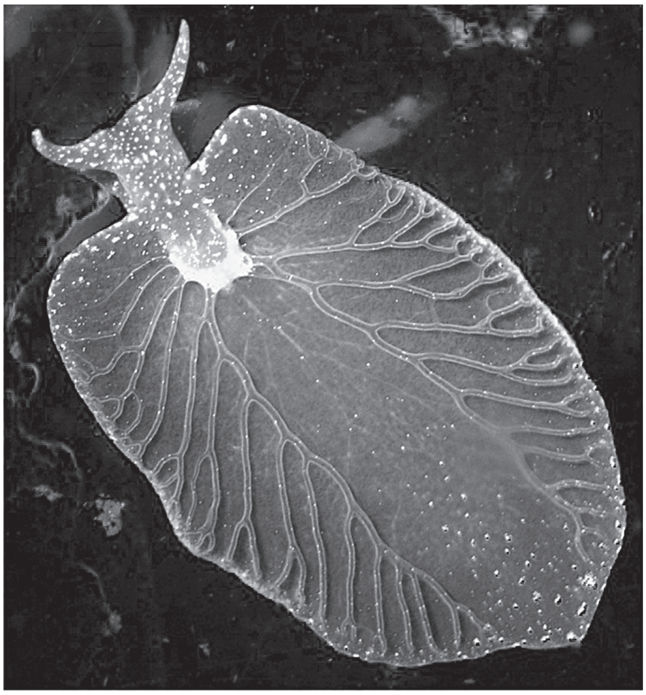

খোলশহীন শামুক

কোন বহুকোশী প্রাণীদের দেহে খাদ্য সংশ্লেষ ঘটে? বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত মাত্র একটি স্বভোজী বহুকোশী প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন। আর সেটি হল একপ্রকার শামুক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পূর্ব উপকূলের অগভীর জলে এই শামুক আবিষ্কার করেছেন প্রফেসর সিডনি কে পিয়ার্স-এর নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী। এই শামুকটির রঙ একেবারে সবুজ। দেহ ইঞ্চিখানেকের মত লম্বা হবে। এর গমন অঙ্গের নাম প্যারাপোডিয়া। প্যারাপোডিয়াকে দেহের দুপাশে প্রসারিত করে একটু একটু করে নাড়াতে নাড়াতে জলের মধ্যে দিয়ে সে যখন যায় তখন দেখে মনে হয় যেন একটা সবুজ পাতা জলের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছে। পাতায় যেমন শিরা-উপশিরা থাকে, ঠিক তেমনই এর প্যারাপোডিয়াতেও শিরা-উপশিরা থাকে। শামুকটির কোনও খোলক নেই। খোলকহীন শামুককে ইংরেজিতে বলে স্লাগ (Slug)। এই স্লাগের বিজ্ঞানসম্মত নাম এলিসিয়া ক্লোরোটিকা (*Elysia chlorotica*)। ক্লোরোফিলের উপস্থিতির জন্যই এর প্রজাতিগত নাম দেওয়া হয়েছে ক্লোরোটিকা। শামুকটি কেবল এক প্রকার সামুদ্রিক উদ্ভিদকেই খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। সেই উদ্ভিদ হল এক প্রকার শ্যাওলা নাম ভাউকেরিয়া লিটোরিয়া (*Vaucheria litorea*)। ভাউকেরিয়া হল সবুজ শ্যাওলা এবং সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাদ্য তৈরি করতে পারে।

এলিসিয়া জন্মের সময় আদৌ সবুজ রঙের হয় না। তখন তার রঙ থাকে বাদামি, আর তার উপর লাল রঙের ফুটকি। জন্মের পর

সবুজ শ্যাওলা

এলিসিয়া খেতে শুরু করে ভাউকেরিয়া। যে কোনও সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষকারী কোশে থাকে এক প্রকার অঙ্গাণু যার নাম ক্লোরোপ্লাস্ট। এই ক্লোরোপ্লাস্ট হল সালোকসংশ্লেষের আসল যন্ত্র। ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে থাকে ক্লোরোফিল নামক সবুজ কণা। এই কণাগুলোর কাজ হল সূর্যালোকের আলোকশক্তিকে সংগ্রহ করা। ওই শক্তি পরে উৎপাদিত খাদ্যের মধ্যে আটকা পড়ে। পুরো কর্মকান্ড ঘটে ওই ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে। ভাউকেরিয়ার কোশে সেই ক্লোরোপ্লাস্ট আছে। কিন্তু কোনও বহুকোশী প্রাণীর দেহকোশে যেমন ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না, তেমনই জন্মের পর এলিসিয়ার দেহকোশেও ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না। কিন্তু যেই না শিশু এলিসিয়া ভাউকেরিয়া খাওয়া শুরু করে অমনি তার দেহের রঙ সবুজ হয়ে যেতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেন, পরিণত এলিসিয়ার দেহকোশে ক্লোরোপ্লাস্ট উপস্থিত। সুতরাং আর কোনও সন্দেহ থাকে না যে ভাউকেরিয়ার ক্লোরোফিলসহ ক্লোরোপ্লাস্ট এলিসিয়ার কোশে গিয়ে ঢুকেছে। একে ক্লোরোফিল চুরি ছাড়া আর কীই বা বলা যায়!

কিন্তু কীভাবে একটা উদ্ভিদের একটা কোশ অঙ্গাণু একেবারে অক্ষত অবস্থায় খাদক প্রাণীর কোশে গিয়ে ঢুকে যায়, আর সেখানে গিয়ে সে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে থাকে? এ পর্যন্ত বলতে বা শুনতে ব্যাপারটা যতটা সহজ বলে মনে হচ্ছে তা কিন্তু আদৌ নয়। পুরো প্রক্রিয়াটি জানতে বিজ্ঞানীদের বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, আর সত্য উদ্ভাবনের পর বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়েছে। এলিসিয়ার পরিপাকনালির একটা ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য এর জন্য দায়ী। আমরা যেমন খাবার খেলে সেই খাবার আমাদের পরিপাকনালিতে গিয়ে বিভিন্ন উৎসেচকের ক্রিয়ায় ভেঙে গিয়ে সরল উপাদানে পরিণত হয় এবং শেষে সেই সরল উপাদান অন্ত্রের আবরণী কোশ দ্বারা শোষিত হয়ে রক্তে গিয়ে মেশে, এলিসিয়ার ক্ষেত্রে তেমনটা পুরোপুরি ঘটে না। ওদের অন্ত্রে ভাউকেরিয়ার ক্লোরোপ্লাস্ট পরিপাক হয় না। আর অন্ত্রের আবরণীতে এমন একপ্রকার কোশ আছে যারা ওই ক্লোরোপ্লাস্টকে সরাসরি অক্ষত

অবস্থায় গিলে নেয়। এলিসিয়ার অন্ত্র প্রচুর শাখাযুক্ত হয়। ওইসব শাখা অন্ত্র থেকে প্যারাপোডিয়াতে বিস্তৃত হয়। ফলে ক্লোরোপ্লাস্ট প্যারাপোডিয়ার কোশেও প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। তখন এলিসিয়ার রঙ হয়ে ওঠে সবুজ। আর তখন সে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাবার তৈরি করতে শুরু করে দেয়।

তবে বিজ্ঞানীরা এটুকু জেনে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তার কারণ দুটো। প্রথমতঃ, পরীক্ষায় দেখা গেল কোনও ভাউকেরিয়া না খেয়েও এলিসিয়া দিব্যি ন-মাস পর্যন্ত বহাল তবিয়তে থাকতে পারে। আর এই সময় সে রীতিমত ক্লোরোফিল সংশ্লেষ করে সালোকসংশ্লেষ চালায়। এটা কী করে সম্ভব? আর দ্বিতীয়তঃ, ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে একটা ছোট চক্রাকার ডি.এন.এ. থাকে। ওই ডি.এন.এ.-তে কিছু জিনও থাকে। জীবদেহের যে কোনও ক্রিয়া জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় একথা সবাই জানি। সালোকসংশ্লেষের ক্ষেত্রেও সে-কথা প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে ক্লোরোপ্লাস্টে সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিনগুলোর ৯০ শতাংশ তৈরি করে নিউক্লিয়াসের ডি.এন.এ.-তে থাকা জিন। আবার ওইসব প্রোটিনের আয়ুও দীর্ঘস্থায়ী নয়। অর্থাৎ নিউক্লিয়াস-মধ্যস্থ ডি.এন.এ. জিনকে বারবার ওইসব প্রোটিন তৈরি করে যেতে হয় সালোকসংশ্লেষ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। উদ্ভিদজগতের এই স্বতঃনিয়ম মেনে ভাউকেরিয়ার ক্ষেত্রেও সালোকসংশ্লেষের জন্য দায়ী জিনগুলির বেশিরভাগ জিন অবস্থান করে কোশের নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকা ডি.এন.এ.-তে। তাহলে এলিসিয়ার কোশে ভাউকেরিয়ার ক্লোরোপ্লাস্ট এসে প্রবেশ করলে সালোকসংশ্লেষ কীভাবে সম্ভব?

এই দুটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে প্রফেসর পিয়ার্স ও তাঁর দলবল উদ্যোগী হলেন। এলিসিয়ার কোশে ক্লোরোপ্লাস্টের উপস্থিতি তাঁদের যতটা না অবাক করেছে তার থেকে বেশি অবাক করেছে ক্লোরোপ্লাস্টের সক্রিয়তা। বহুদিন আগে থেকেই বিজ্ঞানীদের একটা ধারণা আছে যে বহু কোটি বছর আগে সমুদ্রে প্রাণ সৃষ্টির ঠিক পরে আবির্ভূত প্রথম সালোকসংশ্লেষে সক্ষম উদ্ভিদ সায়ানোব্যাকটেরিয়া থেকেই পরবর্তী সময়ে ক্লোরোপ্লাস্ট অঙ্গাণুর উদ্ভব হয়েছে। সেজন্যই ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে একটা ছোট ও কম সক্রিয় ডি.এন.এ. আছে। সায়ানোব্যাকটেরিয়া কোনও এক সুদূর অতীতে সামুদ্রিক উদ্ভিদের সঙ্গে হয়ত নিবিড় বন্ধুত্ব অর্থাৎ অন্তঃমিথোজীবিতা গড়ে তুলেছিল, যেমনটি লাইকেনে ছত্রাক ও সায়ানোব্যাকটেরিয়ার মধ্যে দেখা যায়। তারপর কোনও এক সময়ে সেই সায়ানোব্যাকটেরিয়া অঙ্গীভূত হয়ে যায় বন্ধু উদ্ভিদের কোশে। তারপর সে উদ্ভিদকোশের অপরিহার্য অঙ্গাণু হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ সব বিজ্ঞানীদের ধারণায় রয়েছে। কিন্তু প্রাণীকোশে সে কীভাবে সক্রিয় হয় তা জানা খুব জরুরি। সুতরাং প্রফেসর পিয়ার্স ও তাঁর সঙ্গীরা এলিসিয়া আর ভাউকেরিয়ার ডি.এন.এ.-তে অবস্থিত জিনের বিশ্লেষণ করা শুরু করলেন। আর উত্তর পেয়েও গেলেন। অবাক কান্ড! ভাউকেরিয়ার কোশে সালোকসংশ্লেষের জন্য দায়ী

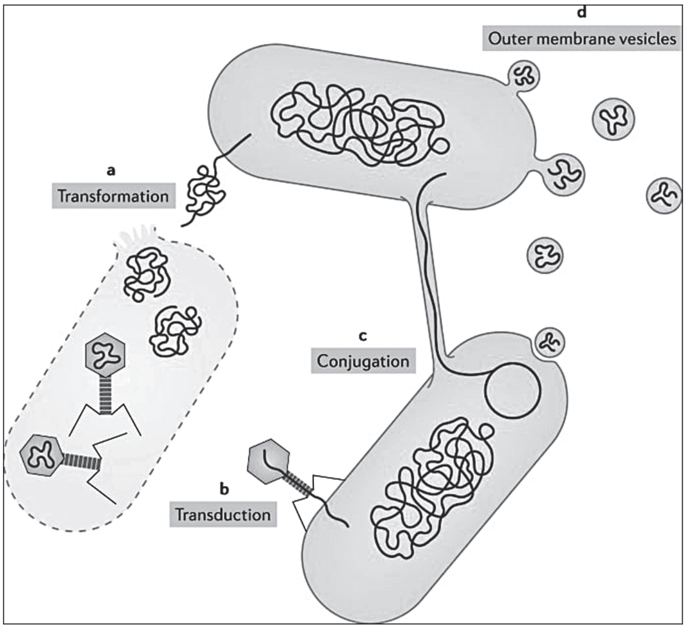

জিন ট্রান্সফার

অনেকগুলি জিন যা তার নিউক্লিয়াসের ডি.এন.এ.-তে রয়েছে সেগুলো এলিসিয়ার কোশের নিউক্লিয়াসের ডি.এন.এ.-তেও উপস্থিত! তার

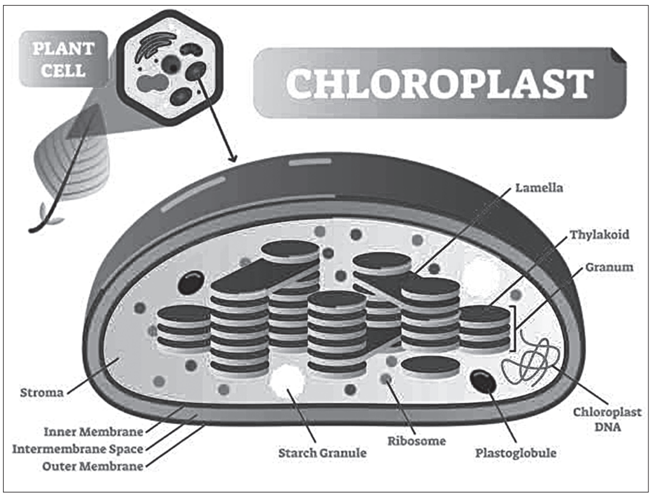

ক্লোরোপ্লাস্ট

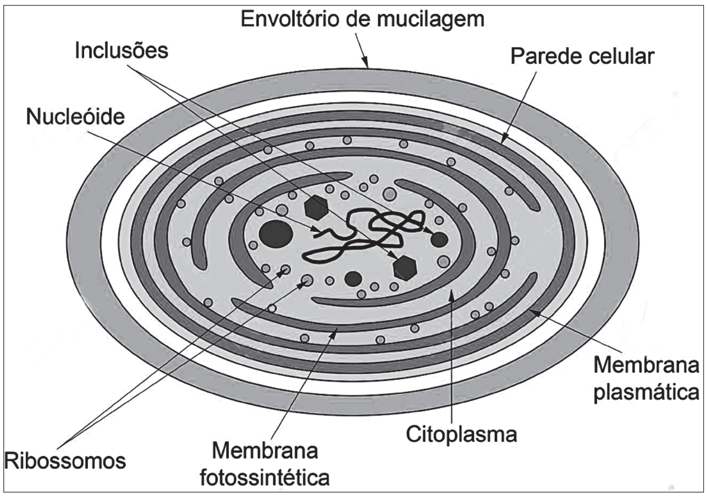

সায়ানোব্যাকটেরিয়া

মানে শুধু ক্লোরোপ্লাস্ট নয়, ভাউকেরিয়ার নিউক্লিয়াসের ডি.এন.এ.-তে অবস্থিত কিছু জিনকেও এলিসিয়া কোনও এক সময়ে নিজের প্রয়োজনে নিজের ডি.এন.এ.-র মধ্যে অঙ্গীভূত করে নিতে সক্ষম হয়েছে! এমন তাজ্জব ঘটনা ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে নজিরবিহীন না হলেও বহুকোশী উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ক্ষেত্রে একেবারেই নজিরবিহীন। এমন জিন স্থানান্তরকে পরিভাষায় বলা হয় অনুভূমিক জিন স্থানান্তর বা হরাইজোন্টাল জিন ট্রান্সফার (HGT)। ব্যাকটেরিয়ারা পরস্পরের মধ্যে এমন জিন স্থানান্তর (HGT) করতে পারে বলেই একটা ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন অন্য ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তরিত হতে পারে। কিন্তু তা বলে একটা বহুকোশী উদ্ভিদ ও একটা বহুকোশী প্রাণীতে এমন জিন স্থানান্তরের ঘটনা আগে কখনো দেখা যায়নি। নিউক্লিয়াসের জিন যেহেতু পিতামাতার দেহ থেকে সন্তান পেয়ে থাকে, তাই শিশু এলিসিয়া বংশানুক্রমিকভাবে ওই জিনগুলি পেয়ে যায়। অপেক্ষা থাকে শুধু ক্লোরোপ্লাস্ট আসার জন্য। এলেই শুরু হয়ে যায় সালোকসংশ্লেষ। তৈরি হতে থাকে খাদ্য গ্লুকোজ। সে গ্লুকোজ কোশের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে এলিসিয়াকে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়।

এলিসিয়া না হয় অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অমেরুদণ্ডী প্রাণী। কিন্তু উন্নত মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যেও ক্লোরোপ্লাস্টের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছেন বিজ্ঞানীরা। আর তা হল স্পটেড বা ছিটওয়ালা স্যালামান্ডার (*Ambystoma maculatum*)। যদিও এলিসিয়ার ত্বক-কোশে ক্লোরোপ্লাস্টের উপস্থিতি এবং তার কাজের সাথে এক্ষেত্রে কোনও মিল পাওয়া যায় না, তবুও বিষয়টি উপেক্ষণীয় নয়। স্যালামান্ডার উভচর প্রাণী। পূর্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় এই স্যালামান্ডার প্রচুর পাওয়া যায়। মূলতঃ পর্ণমোচী জঙ্গলই এদের ঠিকানা। এরা স্বভাবে নিশাচর। দিনের বেলা পাথরের খাঁজ বা পাতার আড়ালে বা মাটির নীচে গর্ত করে থাকে, আর রাত হলে খাবারের সন্ধানে বেরোয়। খাবার বলতে প্রধানতঃ পোকামাকড়। এরা প্রায় ন-ইঞ্চি লম্বা হয়। পূর্ণাঙ্গ ছিটওয়ালা স্যালামান্ডার দেখতে ভারি সুন্দর। সারা গায়ের রঙ কালো বা গাঢ় বাদামি, আর তার উপর অপূর্ব হলুদ ছিট।

পূর্ণাঙ্গ স্যালামান্ডারের দেহে কিন্তু ক্লোরোপ্লাস্টের উপস্থিতি দেখা যায় না। একমাত্র ভ্রূণের মধ্যেই ক্লোরোপ্লাস্ট পাওয়া গেছে। এর কারণও নির্ণয় করেছেন বিজ্ঞানীরা। স্ত্রী স্যালামান্ডার বর্ষামুখর এক রাতে কোনও এক ছোট ডোবায় অগভীর জলে ডিম পেড়ে আসে। প্রায় ১০০টি ডিম একটা গুচ্ছে থাকে। ডিমগুলোর গুচ্ছ জলজ ঘাসে আটকে যায়। ওরা যেখানে ডিম পাড়ে সেখানে বাস একপ্রকার এককোশী সবুজ শ্যাওলার, যার সাধারণ নাম স্যালামান্ডার-শ্যাওলা, বিজ্ঞানসম্মত নাম *Oophila amblystomatis*। ডিমের মধ্যে থাকা ভ্রূণের সাথে ওই শ্যাওলার এক অনন্য মিথোজীবিতার সম্পর্ক রয়েছে। ডিমের বাইরে জেলির মত একপ্রকার আবরণ থাকে যা ডিমের মধ্যে থাকা ভ্রূণকে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে ও নানা পুষ্টি উপাদান জল থেকে ভ্রূণের মধ্যে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। কিন্তু এতে একটা সমস্যাও হয়, তা হল ভ্রূণের মধ্যে ভালভাবে অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে না। মিথোজীবিতার শর্তই হল পরস্পরের উপকার করা। স্যালামান্ডার-শ্যাওলা, ছিটওয়ালা স্যালামান্ডারের ভ্রূণের ভেতরে ঢুকে পড়ে নিজের পুষ্টির জন্য। ডিমের মধ্যে থাকা ভ্রূণ যে সব রেচন পদার্থ উৎপন্ন করে সেগুলোই স্যালামান্ডার-শ্যাওলাকে পুষ্টি জোগায়। সেইসঙ্গে ভ্রূণের শ্বসনের ফলে যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় তা সালোকসংশ্লেষের কাজে লাগায়। অপরদিকে ওই শ্যাওলা সালোকসংশ্লেষ চালানোর সময় যে অক্সিজেন উৎপন্ন করে তা ভ্রূণের শ্বসনের কাজে লাগে। তাছাড়া দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ভ্রূণ শ্যাওলার তৈরি করা গ্লুকোজ থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, স্যালামান্ডার-শ্যাওলার অনুপস্থিতিতে ডিমের মধ্যে থাকা ভ্রূণের বৃদ্ধির হার অনেক কমে যায়, এমনকি ভ্রূণের নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। অবশ্য ভ্রূণ যখন পরিণত ছিটওয়ালা স্যালামান্ডারে পরিণত হয় তখন তার কোশে স্যালামান্ডার-শ্যাওলার উপস্থিতি আর দেখা যায় না।

এই যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে জিন স্থানান্তর কিংবা উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে মিথোজীবিতা আজ আমাদের মনে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েছে—খাদ্যসংকটে বিপন্ন প্রাণীজগত কী তাহলে ভবিষ্যতে উদ্ভিদের মত স্বভোজী হয়ে উঠবে? প্রশ্নটা যে আর অবাস্তব নয় তা তো এলিসিয়া আর ছিটওয়ালা স্যালামান্ডার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে দিয়েছে। এমন বিস্ময়কর ঘটনা শুনতে গল্প বলে মনে হলেও এখন বাস্তব। প্রকৃতির রঙ্গালয় ছাড়া এমন বিস্ময়কর ঘটনা আর কোথায় ঘটবে! প্রকৃতি যেমন নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা, তেমনই নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটায় সেই প্রকৃতিই। বিজ্ঞানীরা শুধু তা খুঁজে বেড়ান।

email:janasoumyakanti@gmail.com
M. 9434570130/9733384720

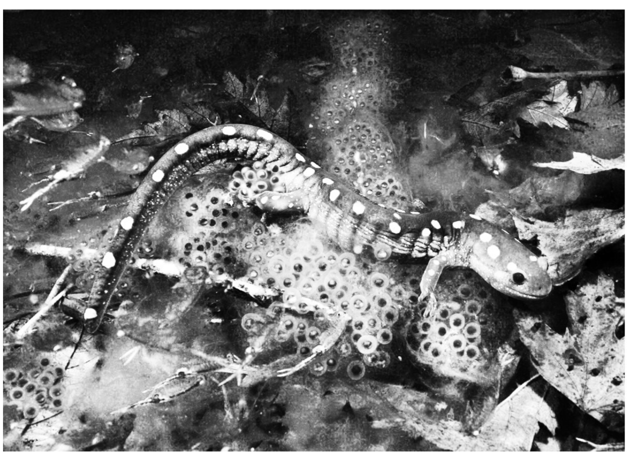

ছিটওয়ালা স্যালামান্ডার

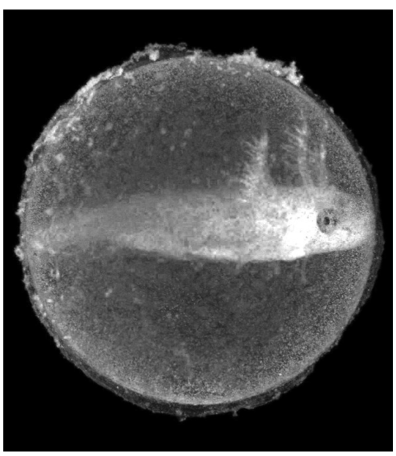

ডিমের মধ্যে থাকা ভ্রূন ও ডিমকে ঘিরে শ্যাওলা

সায়ন্তন যশ

বেগুনের কত গুণ

বেগুনের নাম শুনলেই কিছু মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেন। কারো আবার বেগুনে অ্যালার্জি। যদিও কিছু পরিবারের অন্তত: দু-একজন মানুষ বেগুন পছন্দও করেন। সব মিলিয়ে বেশিরভাগ বাঙালি পরিবারেই সপ্তাহে অন্ততপক্ষে একদিন বেগুনের কোনো একটি পদ রান্না হয়েই থাকে। কিন্তু এই তথাকথিত অপছন্দের সবজিটির বিরাট পুষ্টিগুণের কথা জানলে অনেকেই যে তাদের প্রায় প্রতিদিনের খাদ্যতালিকাতেই বেগুন অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাববেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

যদিও আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তবু বলে রাখি যে Solanaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বেগুন গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Solanum melongena*। অতি পরিচিত বেগুনের আকার-আকৃতি এবং বর্ণগত তারতম্যের কথা প্রায় সকলেরই জানা। বাজারে মূলত বেগুনী, সাদা কিংবা সবুজ রঙের বেগুনের দেখা মিললেও বেগুনী রঙের বেগুন অপেক্ষাকৃত বেশি পুষ্টিকর হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

মূলত ভিটামিন B, C ও K-এর পাশাপাশি পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম এমনকি কপারের মত খনিজ লবণের অন্যতম উৎস এই বেগুন। এর পাশাপাশি বেগুনে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট, ডায়েটরি ফাইবার, বিটা-ক্যারোটিন, ট্রিপটোফ্যান ইত্যাদির মত কিছু অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রায় সম্পূর্ণ কোলেস্টেরল মুক্ত বেগুনে ফ্যাট (বিশেষত saturated fat)-এর পরিমাণ শূন্যের কাছাকাছি।

শুধুমাত্র দৈনিক পুষ্টিচাহিদা মেটানোর পাশাপাশি সুস্থতা প্রদান এবং কিছু রোগের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতেও বেগুন যথেষ্ট কার্যকরী। বেগুনে থাকা ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং ডায়েটরি ফাইবারের উপস্থিতি ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা, কোমলতা ও আর্দ্রতা বজায় রাখে। ত্বকের পাশাপাশি চুলের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যও বেগুনের মধ্যে থাকা উদ্ভিজ্জ পরিপোষক পদার্থ তথা ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট (Phytonutrient)-এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এমনকি খুশকি দূর করতে এবং চুলের বৃদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করতে বেগুনের মধ্যে থাকা বেশ কিছু উৎসেচকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত। বেগুনে উপস্থিত লুটেইন (Lutein) ও জিয়াজ্যান্থিন (Zeaxanthin) নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলি (Anti-oxidant) চোখ সুস্থ রাখতে এবং বার্ধক্যজনিত চোখের ছানি প্রতিরোধে অনেকাংশে কার্যকরী।

বেগুনে থাকা অধিক মাত্রার ডায়েটরি ফাইবার পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশির যথাযথ সঙ্কোচন-প্রসারণ এবং বিভিন্ন পাচক রস নিঃসরণকে নিয়ন্ত্রণ করে পাচনতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। যেহেতু বেগুনের মধ্যে দ্রবীভূত কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ খুব কম, তাই এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা নেয়। বিজ্ঞানীদের মতে, টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বেগুন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সবজি। কোলেস্টেরলের মাত্রা খুব কম হওয়ায় বেগুন হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ উপকারী। এছাড়াও ক্যালোরির পরিমাণ কম হওয়ায় ওজন কমাতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা তাদের খাদ্যতালিকায় বেগুন রাখতেই পারেন। বেগুনে থাকা বিভিন্ন বায়োফ্লাভোনয়েড (Bioflavonoid) মানসিক দুশ্চিন্তা দূর করতে, এমনকি অনিদ্রার মত রোগ সারাতেও সক্ষম। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বেগুনের অন্যতম উপাদান GABA (অর্থাৎ Gammaaminobutyric Acid) মনকে শান্ত করতে এবং ঘুমের উন্নতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিভিন্ন খনিজ লবণের অধিক উপস্থিতির কারণে হাড় সুস্থ রাখতে, হাড়ের ক্ষয় রোধ করতে, এমনকি রক্তাল্পতা নিরাময়েও বেগুন বিশেষ ভূমিকা নেয়। এছাড়াও বেগুনের মধ্যে জীবাণু প্রতিরোধী বিশেষ ক্ষমতা আছে বলেও জানা গেছে। বেগুনের অন্যতম উপাদান জলে দ্রবীভূত নিয়াসিন (অর্থাৎ ভিটামিন B3) শর্করা, প্রোটিন ও ফ্যাট ভেঙে শক্তি উৎপাদন করে, যা আপদকালীন হিসাবে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়। বেগুনের মধ্যে থাকা বিভিন্ন ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট কোষপর্দাকে রক্ষা করে এবং এক কোষ থেকে অন্য কোষের মধ্যে শক্তিশালী যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্মৃতিশক্তির উন্নতিসাধন করে। এসবের পাশাপাশি বৃক্ক ও যকৃৎ সুস্থ রাখতে, আলসার, কোষ্ঠকাঠিন্য সহ বিভিন্ন পাচনজনিত রোগের বিরুদ্ধেও বেগুন বেশ উপকারী।

সবশেষে যে রোগের কথা না বললেই নয়, তা হল ক্যানসার। গবেষণায় জানা গেছে, বেগুন ফেনল সমন্বিত যৌগের (phenolic compounds) এক দারুণ উৎস, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অনেকখানি শক্তিশালী করে তোলে। এর পাশাপাশি বেগুনে থাকা ভিটামিন C রোগ প্রতিরোধের সাথে রক্তে শ্বেতকণিকার উৎপাদন ও কাজে বিশেষ ভূমিকা নেয়। এছাড়াও বিভিন্ন অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড কোষ থেকে free radicals বিতারণ করে কোষকে রক্ষা করে। এর দীর্ঘ ফলস্বরূপ টিউমারের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ক্যানসারের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়। আরেকটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেগুনে উপস্থিত অ্যান্থোসায়ানিন (Anthocyanin) যৌগটি নতুন তৈরি হওয়া কোষকে টিউমার গঠনের হাত থেকে রক্ষা করে এবং ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি ঘটায় এমন উৎসেচককে বাধাপ্রদান করে ক্যানসারের আশঙ্কা দূর করে।

সুতরাং একথা বলাই বাহুল্য যে, নামে গুণহীন হলেও বেগুনের যা গুণ আছে তা হয়ত অনেক সবজিরই নেই। ত্বক ও চুলের পুষ্টির পাশাপাশি হৃদযন্ত্র, বৃক্ক কিংবা যকৃৎকে সুস্থ রাখতেও বেগুনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়াও সাধারণ পাচনতন্ত্রের সমস্যা থেকে শুরু করে মারণ রোগ ক্যানসার—সবকিছুর প্রতিরোধেই অনেকাংশে গুরুত্বপূর্ণ এই তথাকথিত অপ্রিয় সবজিটি। তাই নিজেকে সুস্থ রাখতে বেগুন যুক্ত হোক খাদ্যতালিকার অবিচ্ছেদ্য সবজি হিসাবেই আর মুখে মুখে প্রচারিত হোক ‘বেগুনের কত গুণ!’

email : sayantan.jash98@gmail.com • M. 8514897026

অ মি তা ভ চ ক্র ব র্ত্তী

কচ্ছপ দীর্ঘজীবী হয় কেন?

আমাদের আলিপুর চিড়িয়াখানায় অদ্বৈত-র কথা মনে আছে? অদ্বৈত আসলে এক অ্যালডাব্রা জায়েন্ট টার্টল। শোনা যায় পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৫৭ সালে রবার্ট ক্লাইভ একে নিয়ে এসেছিলেন। ২০০৬ সালে মৃত্যুর সময় সে ছিল বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণী। তবে এই মুহূর্তে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস্ অনুযায়ী দক্ষিণ আটলান্টিকের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে যে প্রাণীটি বাস করে যাকে "স্থলে বিশ্বের প্রাচীনতম প্রাণী" বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার নাম জোনাথন এবং সেও একটি দৈত্যাকার কচ্ছপ। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস্ অনুসারে, জোনাথনের বয়স ২০১৯ সালে ১৮৭ বছর। ১৮৩২ সালে রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে জন্মগ্রহণকারী টাইটানিক যখন উত্তর আটলান্টিকের গভীরে ডুবে যায়, তখন তার বয়স ছিল ৮০ বছর।

জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং ফ্লোরিডা সাউথওয়েস্টার্ন স্টেট কলেজের কচ্ছপ বাস্তুশাস্ত্রবিদ জর্ডান ডোনিনি বলেন, জোনাথন এবং অন্যান্য দৈত্যাকার কচ্ছপই একমাত্র কচ্ছপ নয় যা দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকে। সামুদ্রিক কচ্ছপ ৫০ থেকে ১০০ বছর বাঁচতে পারে এবং বাক্স কচ্ছপ এক শতাব্দীরও বেশি বাঁচতে পারে। আসলে কোনো মানুষ এদের খুঁজে বেরা করার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘজীবী না হওয়ার কারণেই বিজ্ঞানীরা অনেক কচ্ছপ প্রজাতির জীবনের উর্ধ্বসীমা জানেন না।

তাহলে কচ্ছপ এতদিন বাঁচে কেন? আরকানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটির শারীরবিদ্যার সহকারি অধ্যাপক লরি নিউম্যান-লি, যিনি কচ্ছপ এবং অন্যান্য সরীসৃপ নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁর মতে এর পেছনে দুটি উত্তর রয়েছে, একটি বিবর্তনীয় উত্তর এবং একটি জৈবিক উত্তর।

বিবর্তনীয় উত্তরটি তুলনামূলকভাবে সোজা, সাপ এবং রাকুনের মত প্রাণীরা কচ্ছপের ডিম খেতে পছন্দ করে। তাদের জিনগুলি পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করতে, কচ্ছপগুলিকে দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে হয় এবং প্রায়শই প্রজনন করতে হয়, কখনও কখনও প্রতি বছর একাধিকবার এবং প্রচুর ডিম দিতে হয়। নিউম্যান-লি মজা করে বলেন, "এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এদের সন্তান জন্ম দেওয়ার নিরিখে গোটা পৃথিবী এখনো কচ্ছপে ভরে যায়নি।"

কচ্ছপের দীর্ঘায়ুর পিছনে জৈবিক প্রক্রিয়াটি আরও জটিল।

গবেষকদের মতে, কচ্ছপের দীর্ঘায়ুর একটি সূত্র তাদের টেলোমারগুলিতে রয়েছে। টেলোমার হল ডিএনএ-র ননকোডিং স্ট্র্যান্ড দিয়ে গঠিত কাঠামো যা ক্রোমোজোমের প্রান্তগুলিকে টুপির মত ঢেকে রাখে। এই কাঠামোগুলি কোষ বিভাজিত হওয়ার সময় ক্রোমোজোমগুলিকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। সময়ের সঙ্গে, টেলোমারগুলি সংক্ষিপ্ত বা অবনমিত হয়, যার অর্থ তারা আর তাদের ক্রোমোজোমগুলিকেও রক্ষা করতে পারে না, যার ফলে ডিএনএ প্রতিলিপির সমস্যা দেখা দেয়। ফলে ডিএনএ প্রতিলিপি ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং ত্রুটিগুলি টিউমার ও কোষের মৃত্যুর মত বিভিন্ন সমস্যার দিকে পরিচালিত হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা কচ্ছপের দীর্ঘ জীবনে অবদান রাখার সমস্ত কারণ নিশ্চিত করতে পারেননি, তবে তারা কিছু ধারণা প্রস্তাব করেছেন। প্রিপ্রিন্ট ডাটাবেস বায়োআরএক্সিভি-তে ৮ জুলাই পোস্ট করা একটি গবেষণাপত্রে (যদিও এটা নিয়ে এখনো পর্যন্ত সমকক্ষ-পর্যালোচনা করা হয়নি), বিজ্ঞানীদের একটি দল বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়া এবং পদার্থ অন্বেষণ করেছেন, যা কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করে। একটি দৈত্যাকার কচ্ছপ (জোনাথনের মত) সহ বেশ কয়েকটি কচ্ছপ প্রজাতির ক্ষেত্রে কোষগুলি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় তা দেখেছেন গবেষকরা।

গবেষকদের কাছে, দৈত্যাকার কচ্ছপ এবং আরও কয়েকটি কচ্ছপ-প্রজাতি কোষের ক্ষতির দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম বলেই মনে হয়েছে। নিউম্যান-লি বলেন, তারা দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলি হত্যা করে আর এই কাজটি করতে গিয়ে অ্যাপোপ্টোসিস বা প্রোগ্রাম করা কোষের মৃত্যু নামে একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে।

একটি চিকিৎসা পদ্ধতিতে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্রয়োগ করা হয়, এই ধরনের চাপ জীবিত কোষগুলিতে স্বাভাবিকভাবে ঘটে। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ফ্রি-র‍্যাডিকেল (মুক্ত মূলক) মাধ্যমে সৃষ্টি হয়; এই মুক্ত মূলক আবার বিপাকীয় প্রক্রিয়া দ্বারা প্রাকৃতিকভাবে গঠিত অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল অণু। চিকিৎসার সময়, কচ্ছপ কোষে দ্রুত অ্যাপোপ্টোসিস হয়।

নিউম্যান-লি বলেন, "এই প্রবন্ধে যে বিষয়গুলিকে আরও জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে তা হল একটি ধারণা যে, আসলে নিয়ন্ত্রিত অ্যাপোপ্টোসিস সত্যিই মূল্যবান। কারণ যদি দেহে কোনও ক্ষতিকারক কোষ থাকে এবং যদি কোনও জীব এটি দ্রুত অপসারণ করতে পারে,

তবে ক্যানসারের মত অসুখকে এড়ানো যেতে পারে।”

প্রকৃতপক্ষে, প্রজাতিগুলির মধ্যে একটি ছাড়া বাকিদের সমস্ত কোষগুলি এমন চিকিৎসায় সাড়া দেয়নি যেখানে লাইগেজ নামে একটি এনজাইমকে ব্যাহত করার কথা ছিল, যা ডিএনএ প্রতিলিপিকরণ প্রক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য। অন্যভাবে বলতে গেলে কচ্ছপের লাইগেজ সঠিকভাবে কাজ করতে থাকে। এর অর্থ হল, এই কচ্ছপগুলি ডিএনএ-প্রতিলিপি সমস্যাগুলির সম্পূর্ণ প্রতিরোধী কিনা তা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। তবে কচ্ছপগুলি কেন এত দীর্ঘজীবী তার জন্য এটি একটি সম্ভাব্য উত্তর।

email: acnbul13@gmail.com • M. 8367965340

আজব যত নীহারিক ৪

ত ন্ম য় ধ র

ঈগল নীহারিকা (Eagle nebula)

নতুন তারা তৈরির স্বর্গরাজ্য এই অদ্ভুত সুন্দর নীহারিকাটি। পৃথিবী থেকে প্রায় ৭০০০ আলোকবর্ষ দূরে সর্পমন্ডলীর (Constellation Serpens) গভীরে রয়েছে ঈগল নীহারিকা। ওর স্তম্ভের আকৃতির সুবিশাল গ্যাসপুঞ্জগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়টি প্রায় ৯০ আলোকবর্ষ লম্বা; মানে ওর ভেতর সূর্য-গ্রহমন্ডলী-ধূমকেতু সমেত সৌরজগতকে রাখলে ২৬ খানা সৌরজগৎ স্বচ্ছন্দে ওর ভেতর এঁটে যাবে। ঈগল নীহারিকাকে বিজ্ঞানীরা আদর করে ‘সৃষ্টিস্তম্ভ’ (Pillars of creation) বলেও ডাকেন। নীহারিকাটি নক্ষত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে অতি সক্রিয়। এযাবৎ ৪৬০টি উজ্জ্বল তারা তৈরি হয়েছে ওই নীহারিকায়। তারাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়টি সূর্যের চেয়ে ৮০ গুণ ভারী। নীহারিকার কেন্দ্রীয় অংশে থাকা মাত্র ১৫ লক্ষ বছর বয়স্ক ওই তারাটির উজ্জ্বলতা সৌর-উজ্জ্বলতার ১০ লক্ষ গুণ।

১৯৯৫ সাল থেকে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ ঈগল নীহারিকায় চিরুনি তল্লাশি শুরু করে। তার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ওই অতিকায় স্তম্ভগুলি হাইড্রোজেন গ্যাস আর ধুলোয় তৈরি। স্তম্ভগুলি মূলত শিশু-নক্ষত্রদের বিছানা হিসেবে কাজ করে। সম্প্রতি স্পিটজার অবলোহিত টেলিস্কোপের পর্যবেক্ষণে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। ঈগল নীহারিকার ওই সুন্দর স্তম্ভাকৃতি নাকি নিকটবর্তী একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণে নষ্ট হয়ে গেছে। ২০০৭ সালে স্পিটজারের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে যে, সমগ্র নীহারিকাটিই ৮০০০ বছর আগে ঘটা সুপারনোভার ধাক্কায় বিঘ্নিত। ৭০০০ আলোকবর্ষ দূরের ওই সুপারনোভার আলো প্রায় ১০০০ বছর আগে পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু সুপারনোভা-পরবর্তী শক অয়েভ বা অভিঘাত তরঙ্গ আলোর চেয়ে অনেক ধীর গতিতে চলে নীহারিকার স্তম্ভগুলি ভেঙে ফেলেছে। পৃথিবীতে সে অভিঘাত তরঙ্গ আজ থেকে আরো হাজারখানেক বছর পরে পৌঁছবে। তখন ওই ভাঙনের দৃশ্য দেখা যাবে।

email:tstorm.tanmay@gmail.com • M. 9892359674

উপকারিতা

১. চায়ে পলিফেনলস্ ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। এর ফলে ত্বক ভাল থাকে।

২. চায়ে ক্যাফিন ও ফ্ল্যাভোনয়েডস্ (Flavonoids) থাকার জন্য ত্বককে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। পাশাপাশি ত্বককে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করে।

৩. বিবর্ণ চুলকে চকচকে করে।

৪. হজমের গন্ডগোল কমাতে সাহায্য করে।

৫. হৃদরোগ কমায়।

৬. অ্যাজমা বা যারা ঘন ঘন শ্বাস নেয়—এইসব রোগীদের কালো চা খুব উপকারী।

৭. কোলেস্টেরল কমাতে এবং ওজন কমাতে এই চা বেশ কার্যকরী।

৮. এই চা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে।

৯. অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণ থেকে রক্ষা করে।

১০. অকাল বার্ধক্য প্রতিরোধ করে।

চা ও কফিতে কি কি উপাদান থাকে?

চায়ে ২০-২৫ শতাংশ প্রোটিন, ৫ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট থাকে। তিন ধরনের কার্বোহাইড্রেট যথা— মনোস্যাকারাইডস, ডাইস্যাকারাইডস এবং অলিগো স্যাকারাইডস। এদের উপস্থিতির উপর চায়ের মিষ্টতা নির্ভর করে। ভাল পরিমাণে ভিটামিন বি থাকে। এছাড়া ২৮ রকমের ধাতব লবণ থাকে। এর মধ্যে বেশ কিছু উপকারী লবণ যেমন ফ্লোরিন, ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম, আয়োডিন, অ্যালুমিনিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি থাকে। তবে চা পাতা থেকে চা যখন তৈরি হয়, তখন উপাদানগুলি অনেক নষ্ট হয়ে যায়। অল্প পরিমাণে ভিটামিন কে ও ভিটামিন সি থাকে। চায়ে দুরকম উৎসেচক থাকে—পলিফেনল অক্সিডেজ এবং পার-অক্সিডেজ। চায়ে ফ্ল্যাভোনয়েডস্ (অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট), ফ্ল্যাভোনলস্, অ্যাথোসিয়ামিন (চায়ের রঙ-এর উপর নির্ভর করে) থাকে। চায়ে এক ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড (এল-থিয়ামিন) থাকে যা অনুভূতির কাজ করে। সুতরাং চা যথেষ্ট উপকারী পানীয়।

অন্যদিকে চায়ে ক্যাফিন ২-৫ শতাংশ থাকে। প্রচুর পরিমাণে ট্যানিন থাকে। তবে চা বা কফিতে এইসব উপাদান কতটা পরিমাণে পাওয়া যাবে, তা এই সব পাতা ফলের (কফি) প্রজাতির উপর নির্ভর করে। আর কিছুটা নির্ভর করে চা বা কফি তৈরির প্রক্রিয়ার উপর। আর এইসব উপাদানগুলি মানুষের শরীরে নানান প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সাধারণত প্রতি কাপ চায়ে ৭০-১০০ মিলিগ্রাম ক্যাফিন থাকে। আর কফিতে থাকে ১৫-২০ মিলিগ্রাম। ক্যাফিন আবার স্নায়ুর কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ক্যাফিন হৃদপিণ্ডের মাংসপেশির ওপর সরাসরি কাজ করে। ফলে হৃদযন্ত্রের কর্মক্ষমতা ও হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়। তবে অতিরিক্ত মাত্রায় খেলে বুক ধড়ফড় করতে পারে। সমীক্ষায় জানা যায় দৈনিক ৪-৫ কাপ চা থেকে যে পরিমাণ ক্যাফিন আসে, তার ফলে শরীরে কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু যদি ২৫০ মিলি গ্রাম ক্যাফিন শরীরে প্রবেশ করলে মুহূর্তের মধ্যে তার রক্তচাপ বেড়ে যায়।

চায়ে অল্প পরিমাণে থিওফাইলিন, আর কফিতে থিওব্রোমিন উপক্ষার (alkaloids) থাকে। এদের কাজ প্রায় একই রকমের। থিওফাইলিনের শক্তি থিওব্রোমিনের তুলনায় একটু বেশি। এগুলি অনৈচ্ছিক মাংসপেশির শিথিলতা আনে। মূত্র উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। থিওফাইলিন হাঁপানি রোগীদের শ্বাসকষ্টের যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করে।

এছাড়া চায়ে তিন ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে— ১. ক্লোরোফাইলিস ২. ক্যারোটিনয়েডস্ ৩. জ্যান্থোফাইলিস।

চায়ের রঙ এদের উপর নির্ভর করে। চায়ের স্বাদ বা সুগন্ধ নির্ভর করে কয়েকটি উদ্বায়ী পদার্থের উপর। যেমন— ১. লিনালুল, ২. লিনালুল অক্সাইড, ৩. মিথাইল সেলিসাইলেট, ৪. ফিনাইল ইথানল এবং বিভিন্ন ধরনের হেক্সানল।

কফিতে বেশ কিছু উপাদানের নাম উল্লেখ করা হল যথা— ১. প্রায় ১৫০ রকমের অ্যালিফেটিক যৌগ, ২. ৫৬ ধরনের কার্বোরিল যৌগ, ৩. ৯ ধরনের সালফার যৌগ, ৪. ২০ রকমের আলি সাইক্লিক ও ৩০০ রকমের হেটারো সাইক্লিক যৌগ, ৫. ১০ রকমের কিটোনস্ ৬. বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধযুক্ত (Aroma) যৌগ। এছাড়া কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, থিয়াজোলস্, ফেনলস্, ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড ও কয়েকটি উদ্বায়ী পদার্থ।

১৫০ মিলিলিটার চা ও কফি থেকে ৭৯ ও ৯৮ কিলো ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। চা ও কফির আলাদা কোন পুষ্টিমূল্য নেই বললেই চলে। দুধের প্রোটিন (ক্যাসিন) আর চা বা কফির ট্যানিন-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি যৌগ তৈরি করে।

(বাকিটা পরের সংখ্যায়)

email:deyjoydev1964@gmail.com • M. 9474330092

পত্রিকা যোগাযোগ ও প্রাপ্তিস্থান

স্টুডিও ইউনিক, কাঁচরাপাড়া M. 9332280602 • জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 • পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ বারাকপুর M. 8017402774/ 9331035550 • প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 • কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 • তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 • কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 • গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 • জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 • কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 • নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 • উৎপল মুখোপাধ্যায় , বারাসাত M. 9830518798 • ভোলানাথ হালদার , বনগাঁও M. 8637847365, অজয় মজুমদার M. 8918824281 • শিয়ালদহ ও যাদবপুর , রানাঘাট, নৈহাটি, কল্যাণী, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, কাঁচরাপাড়া, মদনপুর, বাদকুল্লা, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) • গৌতম শিরোমনি M. 7364874673 • শকুন্তলা মুখার্জী, বনগাঁও M. 8116480129, সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ, বামা পুস্তকালয়, M. 9434570130 • অনিশ মিত্র, দুর্গাপুর, M. 9093819373 • অরিন্দম রায়, বোলপুর, M. 7001857013 • অলক সরকার, তপন, দ: দিনাজপুর, M. 7001051040 • উত্তম দাস, আলিপুরদুয়ার, M. 9382307460 • সবুজ পৃথিবী প্রযত্নে কোডেক্স, ৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯ • শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, M. 9609844676/7908341942 • ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, M. 9635995476 • দীপাঞ্জন দে, কৃষ্ণনগর ও চাপড়া, M. 9734067466 • বহরমপুর রেলওয়ে বুক স্টল ও বিশ্বাস বুক স্টল, বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড, M. 9474350231

অ নি ন্দ্য দে

রান্নাঘরে তিন্নি

তিন্নি এবারে ক্লাস এইটে উঠেছে। কিন্তু, তাতে কী? স্কুলই তো হচ্ছে না। আর করোনার ভয়ে পার্কে গিয়ে বন্ধুদের সাথে খেলতেও পারছে না। বাড়িতে একেবারেই সময় কাটতে চাইছে না। তাই ও আজকাল মাঝে মাঝে রান্নাঘরে গিয়ে মাকে একটু সাহায্য করছে। এই জায়গাটা কিন্তু বেশ মজার! ও জানতই না এখানে কত মজার মজার ঘটনা ঘটে। এইতো সেদিন উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে গ্যাসটা জ্বালিয়ে দিয়ে মা ওকে বললেন, "জল ফুটে গেলে গ্যাসটা বন্ধ করে দিস।" গ্যাস বন্ধ করেই তো তিন্নি অবাক। গ্যাস বন্ধ করার সাথে সাথে বাষ্প দেখা গেল কী করে? কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তেও যখন ও উত্তরটা খুঁজে পেল না তখন বাধ্য হয়েই মাকে জিজ্ঞেস করতে হল। ততক্ষণে মায়ের চা রেডি

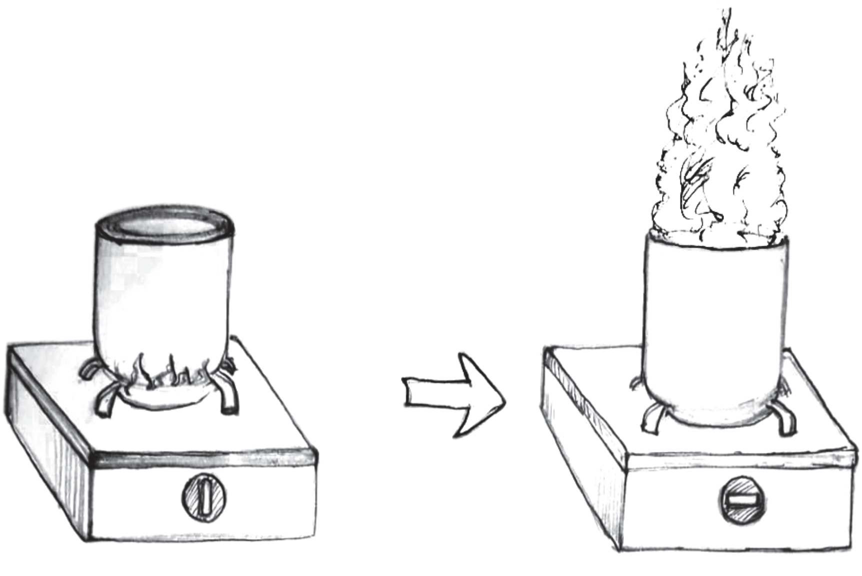

হয়ে গেছে। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে মা ওকে বোঝাতে শুরু করলেন।

আসলে উনুনটা যখন জ্বলছে তখন পাত্রের ফুটন্ত জল থেকে যে বাষ্প উঠে আসে তাকে চোখে দেখা যায় না, এটা স্বচ্ছ। কিন্তু পাত্রকে উনুনের উপরে রেখেই যদি গ্যাস বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন উপরের দিকে উঠতে থাকা বাষ্প আশেপাশের বায়ুর সংস্পর্শে এসে একটু ঠান্ডা হয়ে যায়। ফলে ঘনীভূত হয়ে ছোট ছোট জলকণায় পরিণত হয়। এই জলকণারা কিন্তু স্বচ্ছ নয়, এদেরকে দেখা যায়। আসলে গ্যাস বন্ধ করে দেওয়ার পরে তুই যাদেরকে দেখছিস তারা জলকণা, জলীয় বাষ্প নয়।

সেদিন তিন্নি আরও একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করল। ব্রেকফাস্টে দুধ খেতে গিয়ে ও দেখল দুধে একটুও সর নেই। দুধের সর খেতে তিন্নির দারুণ লাগে। কিন্তু আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় যে দুধটা ও খেয়েছিল তাতে তো বেশ পুরু একটা সর পড়েছিল! মা বললেন "কাল সন্ধ্যায় আসলে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই দুধটা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করার জন্য উনুন থেকে নামিয়ে খোলাই রেখে দিয়েছিলাম, ঢাকা দিইনি।" তিন্নি প্রশ্ন করে উঠল, "তাতে কী হল?" মা বললেন, "দাঁড়া, তোকে বুঝিয়ে বলছি।"

আসলে স্নেহ-জাতীয় পদার্থের ছোট ছোট হাল্কা দানা আর কেসিন নামের প্রোটিন গরম দুধের উপরের তলে ভাসে। পাত্র খোলা থাকলে দুধের উপরের তল থেকে দ্রুত হারে তাপের বিকিরণ হয়, আবার জলীয় অংশের বাষ্পীভবনও হয়। ফলে দুধের উপরিতল অনেক তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হতে থাকে।

উত্তপ্ত অবস্থায় দুধের স্নেহ-জাতীয় অংশ প্রায় তরল অবস্থায় থাকে। কিন্তু দুধের জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হতে শুরু করলে স্নেহ-জাতীয় পদার্থের ছোট ছোট হাল্কা দানাগুলো কেসিনের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে একটা পাতলা পর্দার রূপ নেয়। দুধ যত ঠান্ডা হয়, স্নেহ-জাতীয় অংশ তত পুরু হতে থাকে।

কিন্তু পাত্র ঢাকা থাকলে, উপরের তল থেকে বাষ্পীভবনের হার অনেকটা কমে যায়। ফলে দুধের মধ্যে জলীয় অংশের পরিমাণ অনেকটাই থেকে যায় আর তারা ঐ স্নেহ পদার্থের দানাগুলোকে কেসিনের কাছে আসতে দেয় না। সেই কারণে তারা আর একসাথে জুড়ে যেতে পারে না। ফলত ঐ পর্দাও আর তৈরি হতে পারে না।

email:anindya05@gmail.com • M. 9432220412

অনিন্দ্য দে

আপেক্ষিক তত্ত্ব ঃ একটি সহজ পাঠ

পূর্বকথা

নিউটন দেখিয়েছিলেন যে, সুষম বেগে ধাবমান কোনও ব্যক্তির পক্ষে এমন কোনও যান্ত্রিক পরীক্ষা করা সম্ভব নয় যেটা তাকে বলে দিতে পারবে তিনি স্থির অবস্থায় আছেন যে চলমান অবস্থায় আছেন। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে আইনস্টাইন এই বিষয়টাকেই আরও একটু বিস্তৃত করে বললেন, ঐ ব্যক্তির পক্ষে যান্ত্রিক বা আলোকীয়—কোনও ধরনের পরীক্ষা করেই তার নিজের গতির ব্যাপারটা বোঝা সম্ভব হয়। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে এই পরিধিটাকে আরও বাড়ানো হল। বলা হল অসম বেগে গতিশীল ব্যক্তির পক্ষেও এধরনের কোনও পরীক্ষা থেকে বিষয়টা বোঝা সম্ভব নয়।

পঞ্চম পর্ব

বস্তুর পরম গতি যে দুভাবে মাপা যেতে পারে আগে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) সেকথা আলোচনা হয়েছে : হয় আলোকরশ্মির সাপেক্ষে বস্তুর গতি পরিমাপ করে অথবা বস্তুর যখন ত্বরণ হচ্ছে তখন তার উপরে জাড্যের যে প্রভাব পড়ে তাকে ব্যবহার করে। মাইকেলসন-মর্লের পরীক্ষা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম যে, প্রথম পদ্ধতিটাতে কোনও কাজ হয় না। আর, কেন হয় না তার ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছিলাম আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব থেকে। এখানে আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় পদ্ধতিটাকে নিয়ে অর্থাৎ জাড্যের প্রভাব কীভাবে পরম গতি মাপতে পারে, তা নিয়ে।

অনেক মহাকাশচারীই তাদের স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, রকেট যখন মাটি ছেড়ে আকাশের দিকে ছুটতে শুরু করে, রকেটের ভিতরে বসে মনে হয় কেউ যেন তাকে প্রচন্ড জোরে সিটের মধ্যে চেপে ধরছে। আসলে এটা জাড্যের প্রভাব, তৈরি হচ্ছে রকেটের বেগ পরিবর্তনের ফলে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এটা থেকে কি আমরা বলতে পারব যে রকেটটা গতিশীল? উত্তরটা এভাবে দেওয়া যেতে পারে—সমস্ত গতিই, এমনকি ত্বরণসহ গতিও যদি আপেক্ষিক হয়, তাহলে রকেটকে আমরা একটা স্থির নির্দেশতন্ত্র হিসেবে বেছে নিতে পারব। সেক্ষেত্রে, পৃথিবীসহ সমস্ত বিশ্বজগৎ রকেটের গতির উল্টোদিকে ছুটতে ছুটতে ক্রমশ রকেট থেকে দূরে চলে যাচ্ছে বলে মনে হবে। তাই যদি হয়, তাহলে মহাকাশচারীর উপর ক্রিয়াশীল জাড্যকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব? তার মানে তাকে যে সিটের মধ্যে চেপে ধরা হচ্ছে বলে ঐ মহাকাশচারীর মনে হচ্ছে, সেটাই প্রমাণ করছে যে রকেটটা গতিশীল, মহাবিশ্ব নয়।

পৃথিবীর ঘূর্ণন থেকেও আমরা আরেকটা ভালো উদাহরণ পেতে পারি। পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলটা যে তুলনায় কিছুটা স্ফীত, তার কারণ হল অপকেন্দ্র বল, ঘূর্ণনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাড্যের প্রভাব। সমস্ত গতি যদি আপেক্ষিকই হয় তাহলে এই ঘূর্ণায়মান পৃথিবীকে কি আমরা স্থির নির্দেশতন্ত্র হিসেবে ধরে নিতে পারি না, যেখানে সমগ্র বিশ্বজগৎ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পাক খাচ্ছে বলে মনে হবে? সেটা করা যেতেই পারে কিন্তু তাহলে নিরক্ষীয় অঞ্চলের স্ফীতির কারণটাকে ব্যাখ্যা করব

কীভাবে? সুতরাং, মহাবিশ্ব নয়, পৃথিবীই ঘুরছে, আর সেটা বোঝা যাচ্ছে ঐ স্ফীতি থেকেই। (এখানে অবশ্য অপকেন্দ্র বলের ধাক্কায় এখনও পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চল স্ফীত হচ্ছে কিনা সেই প্রশ্নটা উঠতে পারে। সুদূর অতীতে পৃথিবী যখন এতটা শক্তপোক্ত ছিল না তখন থেকেই এই স্ফীতির উদ্ভব; পৃথিবী ঠান্ডা হয়ে যখন অনেকটা কঠিন হয়েছে তখনও এই স্ফীতিটা রয়ে গেছে, এমনকি পৃথিবীর ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে গেলেও এটা থেকে যাবে। তবে অপকেন্দ্র বলই যে এই স্ফীতির কারণ, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই)।

মহামতি নিউটনও এভাবেই ভেবেছিলেন, তাই বললেন সব গতিই আপেক্ষিক নয়। তার স্বপক্ষে তিনি একটা প্রমাণও খাড়া করেছিলেন। জলভর্তি একটা বালতিকে একটা উল্লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে ঘোরানো হলে অপকেন্দ্র বলের ধাক্কায় উপরিতলের জল বালতির ধারের দিকে চলে আসতে চায়, আর তার ফলে জলের উপরের তল একটা অবতল চেহারা নেয়। ঘূর্ণায়মান বিশ্বজগৎ জলের উপর এই প্রভাব ফেলছে, এটা অবিশ্বাস্য। সুতরাং বালতির গতিকে পরম গতি হতেই হবে।

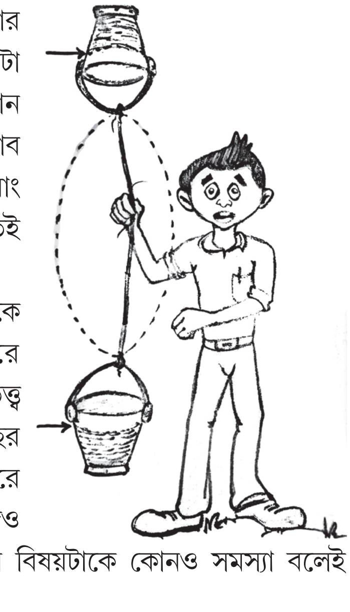

আইনস্টাইন কিন্তু ব্যাপারটাকে দেখতে চাইলেন একেবারে অন্যভাবে। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশ পাওয়ার পরের দশ বছর তিনি ক্রমাগত ভাবনা-চিন্তা করে গেছেন বিষয়টাকে নিয়ে। যদিও বেশিরভাগ পদার্থবিদই সে সময়ে বিষয়টাকে কোনও সমস্যা বলেই

মনে করতেন না। তাঁদের বক্তব্য ছিল, সুষম গতি আপেক্ষিক (বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব যেভাবে দেখিয়েছে) কিন্তু ত্বরণসহ গতি পরম গতি, এভাবে ভাবতে অসুবিধাটা কোথায়? কিন্তু আইনস্টাইন ব্যাপারটাকে এভাবে দেখতে একেবারেই রাজি হলেন না। তাঁর মন বলছিল, সুষম গতি যদি আপেক্ষিক হয়, ত্বরণসহ গতিও আপেক্ষিক হতে বাধ্য। সেই ভাবনাকেই বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের বিস্তৃত রূপ হিসেবে প্রকাশ করলেন ১৯১৬ সালে। নাম রাখা হল 'সাধারণ' আপেক্ষিক তত্ত্ব।

এই সাধারণ তত্ত্বের একেবারে কেন্দ্রস্থলে আছে, আইনস্টাইনের ভাষায়, সমতুল্যতার নীতি, যেটা আসলে মহাকর্ষ আর জাড্য যে প্রকৃতপক্ষে একই বিষয় সে সম্পর্কে (নিউটন হয়ত একে পাগলের প্রলাপ বলতেন) একটা জোরালো বিবৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। আইনস্টাইনের মতে মহাকর্ষ আর জাড্য—একই বিষয়ের দুটো আলাদা নাম।

তবে মহাকর্ষ আর জাড্যের প্রভাবগুলো যে একই রকমের, আইনস্টাইনের আগে আরও অনেকেই কিন্তু ব্যাপারটা অনুধাবন করেছিলেন। নিউটন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দেখা যাক, নিউটন কীভাবে ভেবেছিলেন বিষয়টাকে নিয়ে। ধরা যাক, একটা কামানের গোলা একটা কাঠের বলের থেকে একশো গুণ ভারী, আর তাদেরকে একই উচ্চতা থেকে একসঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হল। তার মানে মহাকর্ষ যে-বলে কামানের গোলাকে নীচের দিকে টানবে তার মান কাঠের বলের টানের তুলনায় একশো গুণ বেশি হবে। সুতরাং, তারা একসাথে মাটিতে পড়বে এটা বিশ্বাস করা যে গ্যালিলিওর শত্রুদের পক্ষে বেশ কঠিন ছিল, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে বায়ুর বাধা খুব নগণ্য হলে, তারা একসঙ্গেই মাটিতে পৌঁছায়। বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করার জন্য নিউটনকে একটা আজব কল্পনা করতে হয়েছিল। তাঁর মতে, মহাকর্ষ যেমন কামানের গোলাকে নীচের দিকে টানছে, ঠিক সেরকমই তার জাড্য—মহাকর্ষের বিপরীতে প্রযুক্ত বাধা—তাকে আটকে রাখতে চাইছে। কাঠের বলের তুলনায় কামানের গোলার মহাকর্ষজনিত টান একশো গুণ বেশি হলে, তার উপর ক্রিয়াশীল জাড্যও যে তাকে পড়তে বাধা দিচ্ছে, একশো গুণ বেশি হবে।

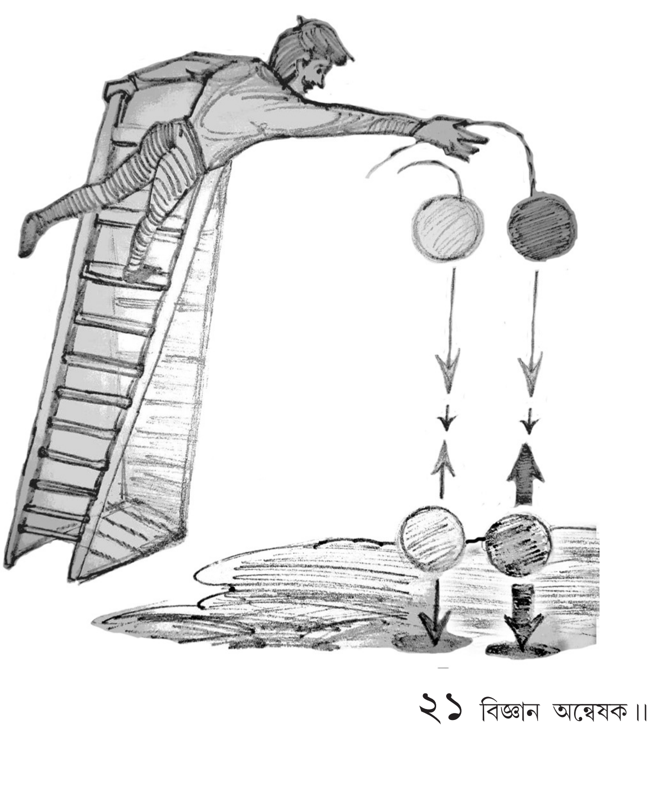

নিউটনের এই ভাবনাটাকে পদার্থবিদ্যার ভাষায় লিখলে দাঁড়ায়; কোনও বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল আর ঐ বস্তুর জাড্য পরস্পর সমানুপাতিক। তা যদি না হয় তাহলেই বিভিন্ন ভরের বস্তু আলাদা

রোল্যান্ড ফন ইয়োটভস

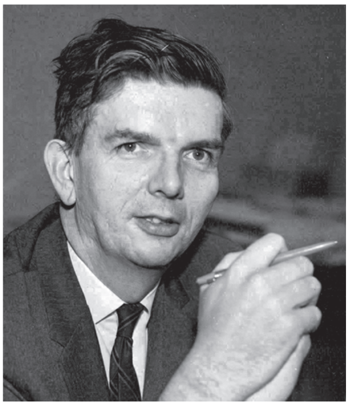
রবার্ট এইচ. ডিকে

আলাদা ত্বরণ নিয়ে নীচের দিকে পড়তে বাধ্য হবে। প্রথম এটা দেখিয়েছিলেন গ্যালিলিও। পরবর্তীকালে, ১৮৯০ সালে, অত্যন্ত নিখুঁত একটা পরীক্ষায় গ্যালিলিওর এই পর্যবেক্ষণকে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন ব্যারন রোল্যান্ড ফন ইয়োটভস (Roland von Eotvos)। ১৯৬০-এর দশকে আরও নিখুঁত প্রমাণ আমরা পেলাম প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট এইচ. ডিকে (Robert H. Dicke) ও সোভিয়েত রাশিয়ার ভি. বি. ব্রাগিন্সকির (V. B. Braginskii) পরীক্ষা থেকে। এই সমস্ত পরীক্ষা থেকে তাঁরা যা পেলেন তাতে এটা স্পষ্ট যে, মহাকর্ষীয় ভর সব সময়েই জাড্য ভরের সমানুপাতিক।

মহাকর্ষ আর জাড্যের এই দড়ি টানাটানির ব্যাপারটা, যে টানাটানিতে সব বস্তু একই ত্বরণ নিয়ে নীচে নামে, নিউটন খুব ভালোই বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু কেন ব্যাপারটা এরকম সেটা ব্যাখ্যা করার কোনও রাস্তা তাঁর কাছে ছিল না। তাঁর কাছে এটা ছিল এক বিস্ময়কর সমাপতন। এই সমাপতনের জন্যই জাড্যকে কাজে লাগিয়ে মহাকর্ষ ক্ষেত্র তৈরি করাও যায়, আবার তাকে সরিয়ে ফেলাও যায়। যেমন, একটা মহাকাশযানকে তার নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরিয়ে যানের ভিতরে একটা কৃত্রিম মহাকর্ষ ক্ষেত্র তৈরি করা যায়। সেক্ষেত্রে অপকেন্দ্র বলের ধাক্কায় মহাকাশযানের ভিতরের জিনিসপত্র দেওয়ালের দিকে চলে আসতে চাইবে। সুতরাং, মহাকাশযানকে নির্দিষ্ট একটা বেগে ঘোরাতে পারলে ভিতরে যে জাড্য বলের ক্ষেত্র তৈরি হবে তার প্রভাব পৃথিবীতে মহাকর্ষ ক্ষেত্রের প্রভাব যেমন, ঠিক সেরকম হতে পারে। সেই অবস্থায় মহাকাশচারীরা মেঝের

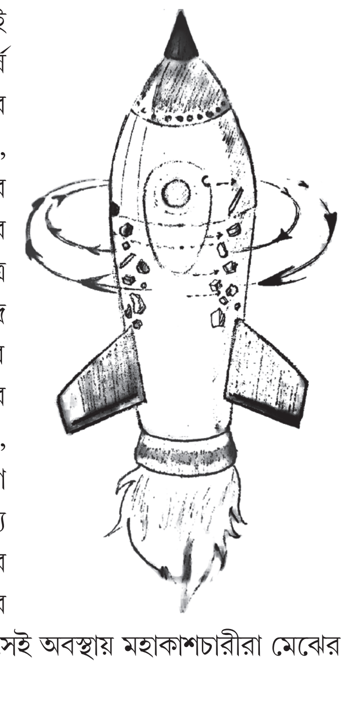

উপর দিয়ে হেঁটে-চলে বেড়াতে পারবেন, কোনও বস্তুকে ছেড়ে দিলে সেটা মেঝের দিকেই পড়বে, ধোঁয়াও ছাদের দিকে উঠে যাবে। অর্থাৎ, সাধারণ মহাকর্ষ ক্ষেত্রের সমস্ত প্রভাবগুলোকেই আমরা সেখানে দেখতে পাব। আইনস্টাইন এই বিষয়টাকেই বর্ণনা করলেন তাঁর বিখ্যাত কাল্পনিক পরীক্ষার সাহায্যে।

ধরা যাক স্পেসে একটা লিফটকে টেনে উপরের দিকে তোলা হচ্ছে, আর তার বেগ ক্রমশঃ বাড়ছে। যদি এই ত্বরণ (বেগ বৃদ্ধির হার) সুষম হয়, আর পৃথিবীতে যে-ত্বরণ নিয়ে কোনও বস্তু নীচের দিকে নামে তার সমান হয়, তাহলে ঐ লিফটের যাত্রীদের মনে হবে তারা পৃথিবীর মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যেই আছেন।

এখানে ত্বরণ শুধু যে মহাকর্ষকে নকল করছে তা-ই নয়, মহাকর্ষকে সে প্রতিহত করতেও পারে। লিফট যদি নীচের দিকে নামত, সেক্ষেত্রে নিম্নমুখী ত্বরণ লিফটের ভিতরে মহাকর্ষকে পুরোপুরি প্রতিহত করে দিত। সেই কারণেই কোনও লিফট যতক্ষণ পর্যন্ত অবাধে পতনশীল অবস্থায় থাকে তার ভিতরে মহাকর্ষ-শূন্য একটা অবস্থা বিরাজ করে।

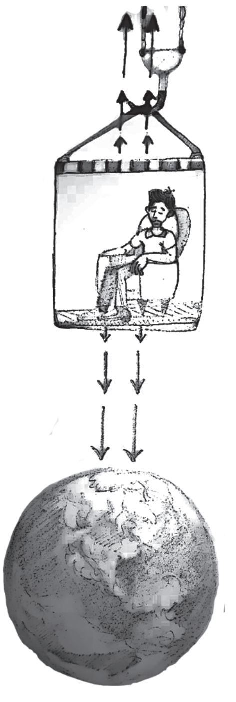

কিন্তু আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের আবির্ভাবের আগে পযন্ত মহাকর্ষ আর জাড্যের এই সাদৃশ্যের কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। বিশেষ তত্ত্বের মত এখানেও তিনি খুব সহজ কিন্তু অত্যন্ত সাহসী একটা অনুমান করে নিলেন। বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে তিনি বলেছিলেন, ইথার নেই বলে যে মনে হচ্ছে তার কারণ হল ইথার নেই। ঠিক সেরকমই, সাধারণ তত্ত্বের গোড়াতেও তিনি বলে দিলেন যে, মহাকর্ষ আর জাড্যকে যে একইরকম বলে মনে হচ্ছে, তার কারণ তারা একই, তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই।

তাই যদি হয়, তাহলে অবাধে পতনশীল লিফটের ভিতরে কৃত্রিমভাবে মহাকর্ষহীন অবস্থা তৈরি করা হচ্ছে সেটা বলা ঠিক হবে না। মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ব্যক্তি যেহেতু পৃথিবীর মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে আছেন, তাই তার মনে হবে এই মহাকর্ষই লিফট ও তার যাত্রীদেরকে নীচে নামিয়ে আনছে। কিন্তু লিফটের যাত্রীদের যারা ঐ লিফটকেই নির্দেশতন্ত্র হিসেবে ভাবছেন, তাদের মনে হচ্ছে পৃথিবী এবং সমগ্র বিশ্বজগৎ ত্বরণসহ তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এই ত্বরণ একটা মহাকর্ষ ক্ষেত্র তৈরি করবে যা পৃথিবীর চারদিকের ক্ষেত্রকে প্রতিহত করে দেবে। সেক্ষেত্রে ঐ ক্ষেত্র সমীকরণগুলো এমন হবে যে, লিফটের যাত্রীরা যদি পুরো ঘটনাটাকে বর্ণনা করতে চান তাহলে তাদের কাছে পৃথিবীর মহাকর্ষ ক্ষেত্রটা পুরোপুরি উধাও হয়ে যাবে। তার মানে সত্যিই সেটা একটা মহাকর্ষহীন অবস্থা।

ঠিক একইভাবে, ঘুরন্ত মহাকাশযানে বা উপরের দিকে ত্বরণসহ গতিশীল লিফটেও কৃত্রিম মহাকর্ষের সৃষ্টি হচ্ছে এটা বলা ঠিক হবে না। সেখানে সত্যিকারের মহাকর্ষই কাজ করছে, শুধু সেই মহাকর্ষ ক্ষেত্রের জ্যামিতিক গঠন, পৃথিবীর মত বিশাল আকারের বস্তুর চারদিকে যে-ক্ষেত্র তৈরি হয়, তার মত নয়। অর্থাৎ, মহাকর্ষ আর জাড্য এরা আলাদা কিছু নয়, এক এবং অভিন্ন। আর এই অভিন্নতাই দেখিয়ে দিল যে মহাবিশ্বের দিকে চোখ মেলে তাকাতে হলে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বই একমাত্র রাস্তা।

সমস্ত গতি, এমনকি ত্বরণসহ গতিও যে আপেক্ষিক সেটা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হল মহাকর্ষ আর জাড্যের এই সমতুল্যতা—আইনস্টাইনের সমতুল্যতার নীতি থেকেই। কীভাবে সেটা হচ্ছে দেখা যাক। আইনস্টাইনের লিফট যখন ত্বরণসহ উপরে উঠছে লিফটের ভিতরে জাড্যের প্রভাব দেখা যাবে। কিন্তু ঐ লিফটকেই স্থির নির্দেশতন্ত্র ভেবে নিলে সমগ্র মহাবিশ্ব, তার সমস্ত গ্যালাক্সিকে নিয়ে ত্বরণসহ নীচের দিকে চলে যাচ্ছে বলে মনে হবে। মহাবিশ্বের এই ত্বরিত গতিই একটা মহাকর্ষ ক্ষেত্রের সৃষ্টি করবে। এই ক্ষেত্র লিফটের ভিতরের জিনিসপত্রকে মেঝের দিকে ঠেলে দিতে চাইবে। সুতরাং, লিফটের ভেতরের লোকজনের কাছে একে মহাকর্ষের প্রভাব বলেই মনে হবে।

এখন প্রশ্ন হল যে, আসলে কী ঘটছে? লিফট এগোচ্ছে আর তার জন্য জাড্যের প্রভাব পড়ছে, নাকি মহাবিশ্ব ছুটে চলেছে বলে মহাকর্ষের প্রভাব পড়ছে? কিন্তু এটা আদপে কোনও সঠিক প্রশ্নই নয়। কারণ, ‘প্রকৃত’ পরম গতি বলে কিছু হয় না। যা হয় সেটা লিফট আর মহাবিশ্বের মধ্যে আপেক্ষিক গতি। এই আপেক্ষিক গতিই সৃষ্টি করে এক বল ক্ষেত্রের, আর সেই ক্ষেত্রের সমীকরণগুলোই হল সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের উপজীব্য। পছন্দসই নির্দেশতন্ত্রের উপর নির্ভর করে সেই ক্ষেত্রকে আমরা যেমন জাড্য বল থেকে উদ্ভূত বলে ভাবতে পারি, আবার মহাকর্ষজাত বলেও ভাবতে পারি। লিফট যদি নির্দেশতন্ত্র হয়, সেক্ষেত্রে আমরা বলব ঐ ক্ষেত্র মহাকর্ষীয়; আর মহাবিশ্বকে যদি নির্দেশতন্ত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয় তাহলে বলতে হবে ঐ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে জাড্যের প্রভাবে। অর্থাৎ, জাড্য আর মহাকর্ষ আসলে একই বিষয়, শুধু তাদের নাম দুটো আলাদা; বিশেষ কোনও একটা পরিস্থিতিতে সুবিধামত এদের যেকোন একটাকেই আমরা কাজে লাগাতে পারি। তবে মহাবিশ্বকে স্থির নির্দেশতন্ত্র ধরে এগোনোটা যেমন অনেক সহজ, তেমনই সুবিধাজনকও বটে। সেক্ষেত্রে উর্ধ্বগামী লিফটের ভিতরের ক্ষেত্রকেই কেউই মহাকর্ষজাত বলতে চাইবেন না। কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব বলছে, সঠিক নির্দেশতন্ত্র বেছে নিতে পারলে ঐ ক্ষেত্রকেও আমরা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র বলে ভাবতে পারব। আমাদের এই পছন্দটাকে ‘ভুল’ প্রমাণ করতে পারে এমন কোনও পরীক্ষাই লিফটের ভিতরে বসে করা সম্ভব নয়।

তবে লিফটের যাত্রীরা কিন্তু বলতে পারবেন না, মহাকর্ষ না জাড্য, কে তাদেরকে নীচের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা তাদের নিজেদের ক্ষেত্রের সাথে পৃথিবীর মত বড়সড় বস্তুর চারদিকে তৈরি হওয়া মহাকর্ষ ক্ষেত্রের পার্থক্যটাকে বুঝতে পারবেন না। পৃথিবীকে ঘিরে তৈরি হওয়া মহাকর্ষ ক্ষেত্রের চেহারাটা গোলকাকার, ত্বরণসহ গতিশীল লিফটের ক্ষেত্রে সেরকম হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। একই উচ্চতার এক মিটার দূরত্বে রেখে দুটো পাথরের টুকরোকে যদি অনেক উঁচু থেকে নীচের দিকে ছেড়ে দেওয়া হয়, দেখা যায়

যে তারা নীচে নেমে আসার সময়ে ক্রমশঃ কাছাকাছি চলে আসছে, কারণ তারা দুজনেই পৃথিবী কেন্দ্রের দিকে যেতে চাইছে। কিন্তু চলমান লিফটে সব বস্তুই পরস্পর সমান্তরাল পথ ধরে নীচের দিকে নামবে।

আরও একটা সহজ উদাহরণের সাহায্যে এই দুই ক্ষেত্রের পার্থক্যটাকে বোঝার চেষ্টা করা যাক। ধরা যাক এবারে পাথরের টুকরোদুটো একই উচ্চতায় নেই, তাদের উচ্চতার পার্থক্য এক মিটার। ত্বরণসহ উপরের দিকে গতিশীল কোনও লিফটের ভিতরে এরকম দুটো পাথরকে একসাথে ছেড়ে দিলে, নীচে নামার সময়ে তাদের মধ্যেকার দূরত্বের কোনও পরিবর্তন হয় না, এক মিটার থাকবে। কিন্তু পৃথিবী মাটির বেশ কিছুটা উপর থেকে ঐ পাথর দুটোকে ছাড়া হলে তাদের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে; কারণ যে পাথরটা নীচে আছে, সে তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর কেন্দ্রের কাছে আছে, ফলতঃ তার ত্বরণও বেশি হবে।

এই দুটো অভিজ্ঞতাকে এক জায়গায় এনে এখন তাহলে দেখা যাক, পৃথিবীর মত বেশ বড়সড় গোলকাকার একটা বস্তু যদি সূর্যের মত একটা ভারী বস্তুর দ্বারা সৃষ্ট শক্তিশালী মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কেন্দ্রের দিকে পড়তে থাকে, তাহলে কী হবে। এই অসম ক্ষেত্র গোলকটাকে পাশ থেকে চেপে সংকুচিত করে দিতে চাইবে, আর তার সাথে সাথে গোলকটা যেদিকে পড়ছে সেদিক বরাবর তাকে টেনে লম্বা করে দিতে চাইবে। জ্যোতির্বিদদের ভাষায় এটা 'জোয়ারের বল' (Tidal force)। ছোট্ট একটা ধূমকেতু যদি খুব ভারী একটা নক্ষত্রের দিকে পড়তে থাকে, কিছুদূর যাওয়ার পরই সে টুকরো টুকরো হয় এই বলের কারণেই।

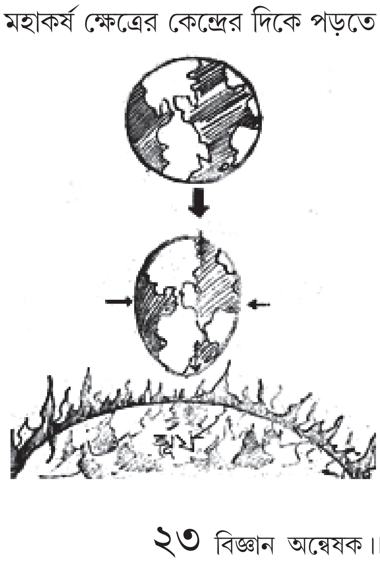

কোনও ভারী বস্তুর চারদিকে যে-শক্তিশালী মহাকর্ষের উদ্ভব হয়, জোয়ারের বলের জন্ম সেখান থেকেই, ত্বরণের ফলে সৃষ্ট মহাকর্ষ বল থেকে এর উদ্ভব হয় না। এমন কোনও নির্দেশতন্ত্র নেই যেখান থেকে একজন দর্শক এই জোয়ারের প্রভাব দেখতে পাবেন না। ত্বরণসহ গতিশীল লিফটে বসে একজন যাত্রী এই জোয়ারের অস্তিত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতে পারবেন, সেখান থেকে তিনি ঐ ক্ষেত্রের গঠনটা কেমন সেটা বুঝতেও পারবেন। তার মানে এই নয় যে, তিনি জাড্য আর মহাকর্ষের মধ্যে পার্থক্যটাকে ধরতে পারবেন; তিনি আসলে বিভিন্ন জ্যামিতিক গঠনের ক্ষেত্রগুলোর পার্থক্যটাকে বুঝতে পারবেন।

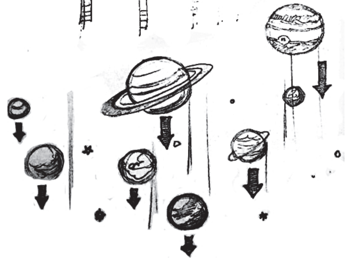

পৃথিবীর ঘূর্ণনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকমের। ভেবে দেখুন, পৃথিবী ঘুরছে না বিশ্বচরাচর তাকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে (অ্যারিস্টটল যেভাবে ভেবেছিলেন) এই তর্কটা আসলে নির্দেশতন্ত্র বেছে নেওয়ার সমস্যা ছাড়া আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই সুবিধাজনক হল মহাবিশ্বকে বেছে নেওয়া। তাহলে আমরা সহজেই বলতে পারব, মহাবিশ্বের সাপেক্ষে পৃথিবী ঘুরে চলেছে, আর জাড্য তার নিরক্ষীয় অঞ্চলকে স্ফীত করে তুলছে। হয়ত একটু অসুবিধা হবে, কিন্তু তাই বলে পৃথিবীকে স্থির নির্দেশতন্ত্র হিসেবে ভেবে নিতে আমাদের কোনও বাধা নেই। সেক্ষেত্রে আমরা বলব বিশ্বচরাচর পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে যে-মহাকর্ষের সৃষ্টি করেছে তার প্রভাব পড়েছে পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে। অবশ্যই এই ক্ষেত্রের জ্যামিতিক গঠন গ্রহের চারদিকে গড়ে ওঠা মহাকর্ষ ক্ষেত্রের জ্যামিতিক গঠনের মত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও একে প্রকৃত মহাকর্ষ ক্ষেত্র আমাদের বলতেই হবে। উল্টোদিকে পৃথিবীকে স্থির নির্দেশতন্ত্র ধরলেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনও সমস্যা হয় না—সূর্য সকালে ওঠে, সন্ধ্যায় অস্ত যায়, উত্তর আকাশে ধ্রুবতারাকে রোজই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল কোন্‌টা ঠিক? পৃথিবী ঘুরছে না কি বিশ্বচরাচর তার চারদিকে ঘুরছে? অসলে এই প্রশ্নটাই অর্থহীন। আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, প্লেটের উপর চায়ের কাপটা দেব নাকি কাপের তলায় প্লেটটা থাকবে, সেটা যেমন অর্থহীন, ঠিক সেরকম।

কিন্তু মহাবিশ্ব যে 'বজ্র-আঁটুনি'তে সব কিছুকে ধরে রেখেছে এটা তো ঠিক (এই শক্তপোক্ত বাঁধন কোথা থেকে আসছে সে ব্যাপারে আমরা পরে আলোচনা করব)। তবে সেখানে একটা অদ্ভুতুড়ে বিষয় আছে। কোনও বস্তু যখন সমবেগে ছুটতে থাকে তখন সে আঁটুনি অনেক হাল্কা, সেই গতির বিরুদ্ধে কোনও বাধা নেই। অথচ যেই মুহূর্তে

বস্তুর গতির পরিবর্তন করতে চাওয়া হয়, বাঁধনটা শক্ত হয়ে ওঠে। মহাবিশ্বকে যদি আমরা স্থির নির্দেশতন্ত্র হিসেবে বেছে নিই, এই বাঁধন হল বস্তুর জাড্য, বেগ পরিবর্তন করতে হলে সে যে বাধা পায়। আর বস্তুকে স্থির নির্দেশতন্ত্র হিসেবে ভাবলে ঐ বাঁধনের নামই হবে মহাকর্ষ, যে-মহাবিশ্ব অসম বেগে ছুটছে, বস্তুকে সেই দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া তার এক প্রবল প্রচেষ্টা।

এতক্ষণের এই আলোচনাটাকে তাহলে এবার অল্প কথায় বলার চেষ্টা করা যাক। নিউটন দেখিয়েছিলেন যে, সুষম বেগে ধাবমান কোনও ব্যক্তির পক্ষে এমন কোনও যান্ত্রিক পরীক্ষা করা সম্ভব নয় যেটা তাকে বলে দিতে পারবে তিনি স্থির অবস্থায় আছেন না চলমান অবস্থায় আছেন। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে এই বিষয়টাকে আরও একটু বিস্তৃত করে বলা হল ঐ ব্যক্তির পক্ষে যান্ত্রিক বা আলোকীয় --- কোনও ধরনের পরীক্ষা করেই তার নিজের গতির ব্যাপারটা বোঝা সম্ভব হয়। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে এই পরিধিটাকে আরও বাড়ানো হল।

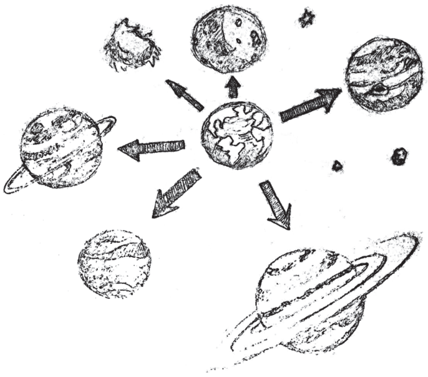

বলা হল অসম বেগে গতিশীল ব্যক্তির পক্ষেও এধরনের কোনও পরীক্ষা থেকে বিষয়টা বোঝা সম্ভব নয়।

অর্থাৎ, সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের মোদ্দা কথা হল, যেকোন দর্শকের কাছেই প্রকৃতির সূত্রগুলো অপরিবর্তনীয়। মানে ঐ দর্শক যেভাবেই গতিশীল হোন না কেন (তিনি পৃথিবীর বা চাঁদের কোনও গবেষণাগারে কর্মরত বিজ্ঞানী হতে পারেন, দূরের কোনও নক্ষত্রের দিকে সামান্য ত্বরণসহ গতিশীল কোনও মহাকাশযানের অভিযাত্রীও হতে পারেন), প্রকৃতির সূত্রগুলোকে তিনি যেভাবে দেখবেন তার বর্ণনা দিতে হলে যে-গাণিতিক সূত্রগুলো লিখতে হবে, সেগুলো সব একই, অভিন্ন। পরের অধ্যায়ে আমরা মহাকর্ষের বিষয়টাকে আরও একটু কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করব।

email: anindya05@gmail.com • M. 9432220412

কৌশিক রায়

শব্দের গতিকে হার মানিয়েছিলেন যে বৈমানিক

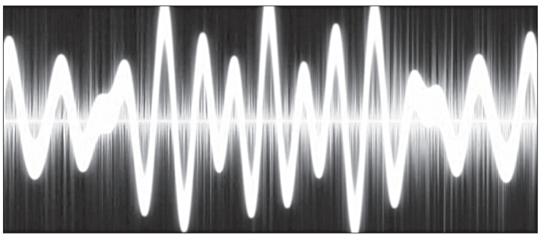

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলেও তার আতঙ্কের রেশ তখনও রয়ে গেছে। এরই মধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এডওয়ার্ডস এয়ারফোর্স বেস বিমানঘাঁটিতে জড়ো হওয়া সামরিক বিমানচালকদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা গেল। শোনা গেল টেস্ট পাইলট ক্যালমার্স স্তডলিন নাকি ১.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজি রেখেছেন। যে বৈমানিক শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে যুদ্ধবিমান, আকাশে ওড়াতে পারবেন—তিনিই জিতবেন এই বিপুল পরিমাণ অর্থ। জমায়েত হওয়া পাইলটরা একে অপরের দিকে চাইতে লাগলেন। শব্দের চেয়ে

দ্রুতগতিতে ফাইটার প্লেন ওড়ানো? মানে, সেকেন্ডে ১১২০ ফিট-এর বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে! এই ভীম গতিতে উড়োজাহাজ চালালে বাতাসের ঘর্ষণে বিমানে আগুন ধরে যাবে। অর্থাৎ, সেই হতভাগ্য বৈমানিকের মৃত্যু অনিবার্য। এই পাইলটদের অনেকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মুখোমুখি, আকাশে "ডগফাইট" করে নাৎসি জার্মানির "স্টুকা" আর "মেসসারস্মিখট"-এর মত জাঁদরেল যুদ্ধ বিমানকে ভূপতিত করেছেন। তবে, শব্দের চেয়ে আরো বেশি গতিতে বিমান চালানো? পাগলের প্রলাপ না কি!

মার্কিনি বৈমানিকরা ইতিউতি চাইছিলেন। তাঁদের মধ্যে থেকে এগিয়ে এলেন পশ্চিম ভার্জিনিয়ার মাহরা-তে জন্মানো, ২৪ বছর বয়স্ক, পেটানো চেহারার, দীর্ঘদেহী এক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন বিমানবাহিনীতে দক্ষতা দেখানো এই যুবকটির আসল নাম চার্লস এলউড ইয়াগার হলেও তাঁর সহকর্মীরা, এই ডাকাবুকো পাইলটটিকে "চাক" নামেই ডাকতেন। ইন্ডিয়ানাপোলিস রাজ্যের ফোর্ট বেঞ্জামিন হ্যারিসন সেনাশিবিরে তালিম নেওয়া চার্লস ইয়াগারের ছেলেবেলাটা ছিল একটা দুঃখের স্মৃতিতে ভরা। বাবা-মা যখন চাষের খেতে কাজ করছিলেন তখন তাঁর চোখের সামনেই, খেলাচ্ছলে ভাইসরয়-এর শটগানের গুলি, দুই বছরের আদরের বোন ডোরিস অ্যান-এর ফুলের মত জীবনটাকে কেড়ে নেয়। ছেলেবেলার সেই দুঃস্বপ্নকে চাক ইয়াগার ভুলতে চেয়েছিলেন আকাশযুদ্ধে দেশের শত্রুকে দমন করার মধ্য দিয়ে। শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে জঙ্গি বিমান চালানোর পরীক্ষার দিন দুয়েক আগে, স্ত্রী গ্লেনিসকে নিয়ে ঘোড়া চালানোর সময় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পাঁজরের দুটি হাড় ভাঙে চাক ইয়াগার-এর। তবুও, ওই ঐতিহাসিক "টেস্ট ফ্লাইট" থেকে যাতে বাতিল না হয়ে যান—সেইজন্য সতীর্থ বৈজ্ঞানিক জ্যাক রিডলি-কে ছাড়া আর কাউকে এই দুর্ঘটনার কথা জানাননি ইয়াগার। স্থানীয় রোজামন্ড শহরের এক স্থানীয় ডাক্তারের সাহায্যে বুকে ব্যান্ডেজ বেঁধে নিয়েছিলেন চার্লস ইয়াগার। বুকে অসহ্য ব্যথা। তবুও দাঁতে দাঁত চেপে "বেল এক্স-ওয়ান" জঙ্গি বিমানটির ককপিটে উঠলেন তিনি। সবসময়েই প্রেরণা দেওয়া স্ত্রীর নামে চাক ইয়াগার, এই এক আসনযুক্ত জঙ্গি বিমানটির নাম রেখেছিলেন "গ্ল্যামারাস গ্লেনিস"। অসহ্য বেদনার জন্য বিমানটির দরজা বা "হ্যাচ" বন্ধ করতে পারছিলেন না ইয়াগার। সমস্যাটার সমাধান করলেন রিডলি। দরজা আটকানোর জন্য অতিরিক্ত লিভার হিসেবে একটি ঝাঁটার অংশ, প্লেনটির দরজার সাথে লাগিয়ে দিলেন তিনি—যাতে দরজা আটকাতে ইয়াগারের হাতে বেশি জোর না লাগে।

একটু ঝাঁকুনি দিয়ে রানওয়ের মাটি ছুঁয়ে আকাশে উড়ল চার্লস ইয়াগারের "বেল-এক্স-ওয়ান" বিমানটি। ক্রমশঃই ক্যালিফোর্নিয়ার মোহাভে মরুভূমির অন্তর্গত "রজার্স ড্রাই লেক" নামক প্রায় জলহীন হ্রদের ওপর দিয়ে উড়তে লাগল ইয়াগারের বিমান। মাটি থেকে তিনি তখন প্রায় ৪৫ হাজার ফিট উচ্চতায় আছেন। শব্দকে ছাড়ানোর গতিবেগ-এর একক হল "ম্যাক" (Mach)। চার্লস ইয়াগারের জঙ্গি বিমান, শব্দের চেয়ে দ্রুতবেগে ১.০৫ ম্যাক গতিবেগে উড়তে লাগল। নিজের চোখেই ওডোমিটারের কাঁটাকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ইয়াগার। শব্দের দুর্ভেদ্য সীমানাকে পেরোতে পেরেছেন তিনি। প্রথম মানুষ হিসেবে এই কৃতিত্ব লাভ করে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। বিমান চালনার অভিধানে যুক্ত হল একটি নতুন শব্দ—"সুপারসোনিক ফ্লাইট" শব্দের শাসনকে তুচ্ছ করে নীল আকাশে পাখিদের মত অবাধ উড়ান। পরবর্তীকালে প্রথম মার্কিন বিমান চালক হিসেবে "মিগ-১৫" জঙ্গি বিমান চালানোর কৃতিত্ব, চার্লস ইয়াগার-ই অর্জন করেছিলেন। ওই বিমানটি চালানোর কথা ছিল মার্কিনী নাগরিকত্ব নেওয়া কোরিয় বৈমানিক নো-ক্যুম-সোক-এর। তিনি হঠাৎই দক্ষিণ কোরিয়াতে চলে যান। চার্লস ইয়াগারের শব্দগতি জয়ের সাফল্য তৈরি করেছিল "টপগান" ছবিতে, টম ক্রুজ অভিনীত পেট মাভেরিক নামক দুঃসাহসী পাইলট চরিত্রটিকে। চার্লস ইয়াগারের আদর্শ এবং সাহায্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রথম মহিলা বৈমানিক হিসেবে শব্দের চেয়ে বেশি গতিবেগে বিমান চালিয়েছিলেন জ্যাকি কোখর্যান। তবে, এরপর একবার ২.৪৪ ম্যাক গতিতে প্রায় ৮০ হাজার ফিট উচ্চতাতে "এক্স-ওয়ান"-এ বিমান চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছিলেন চার্লস ইয়াগার। শূন্যে তখন ঘুরপাক খাচ্ছে তাঁর প্লেন। এক মিনিটে প্রায় ৫১ হাজার ফিট উচ্চতায় বিমানকে নামিয়ে আনেন ইস্পাত স্নায়ুর অধিকারী ইয়াগার। মাটি থেকে প্রায় ২৯০০০ ফিট উচ্চতায় আবার বিমানের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পান চার্লস ইয়াগার। ১৯৬২ সালে প্রথম চাঁদে নামা মহাকাশচারী কম্যান্ডার নিল আর্মস্ট্রং-এর সাথে নেভাদা (লাস ভেগাস)-র স্মিথ রানচ ড্রাই লেক-এর ওপর "টি-৩৩" নামক একটি জেট বিমানও চালিয়েছিলেন ইয়াগার। অবশ্য, ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিজের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান ইয়াহিয়া খানের অনুরোধে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর উপদেষ্টা হতে হয় ইয়াগারকে। তবে মার্কিন দেশের প্রশাসনিক কেন্দ্র পেন্টাগন থেকে ইয়াগারকে যে যাত্রীবাহী প্লেনটি দেওয়া হয়েছিল, সেই "বীচক্র্যাফট" বিমানটি ভারতীয় বিমান হানাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। চার্লস ইয়াগার এজন্য অবশ্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দায়ী করেছিলেন।

৭৪ বছর বয়সেও শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে একটি "এফ-ফিফটিন ডি ঈগল" জঙ্গী বিমান চালিয়েছিলেন চার্লস ইয়াগার। "দ্য রাইট স্টাফ" নামে একটি চলচ্চিত্রে অভিনয়ও করেন তিনি। ৮৯ বছরেও শব্দের চেয়ে জোরে "ম্যাকডোনাল ডগলাস" নামক একটি জঙ্গি বিমান চালান চিরতরুণ ইয়াগার। তবে 'মৃত্যু' নামক শব্দটির গতিকে আর হারাতে পারলেন না তিনি। তাই ৯৭ বছর বয়সে থেমে গেল তাঁর "জীবন" নামক বিমানটি। দূর আকাশে ঝড় তোলা 'চার্লস ইয়াগার' নামটি টিঁকে রইল সবার হৃদয়ে।

email:@gmail.com • M. 000

ভ বা নী প্র সা দ সা হু

ভক্তির জোরে গরুর মুখ থেকে মিথেনের বদলে অক্সিজেন বের করানো সম্ভব?

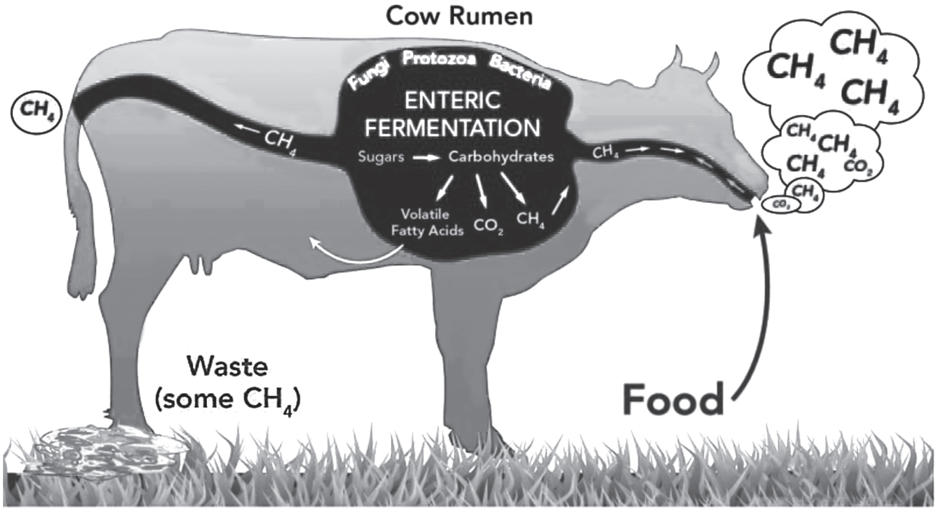

গরু একটি নিরীহ স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডী চতুষ্পদ গৃহপালিত উপকারী জন্তু। বহু হাজার বছর ধরে মানুষ গরু পুষছে। চাষাবাদের জন্য লাঙ্গল করার কাজে তাকে যেমন ব্যবহার করেছে, তেমনি গরুর দুধ ও তা থেকে ঘি, মাখন, গোমাংস ইত্যাদি নির্বিবাদে পেয়েছে। এমনকি গরু মারা যাওয়ার পরও তার চামড়া, শিং, ক্ষুর—এসব কাজে লাগিয়েছে।

এমন একটি উপকারী প্রাণীর থেকে একটিই বিপদ তার নাক-মুখ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস বেরিয়ে বাতাসে মেশে। সব গবাদি পশু থেকেই তা বেরোয়, তবে গরুর থেকেই তা ঘটে সবচেয়ে বেশি। এবং এই মিথেন একটি শক্তিশালী গ্রীন হাউস গ্যাস ও বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য বিরাট ভূমিকা রাখে। গ্রীন হাউস গ্যাসগুলি সূর্য থেকে আসা ইনফ্রারেড বিচ্ছুরণকে শোষণ করে এবং পৃথিবীতে উষ্ণ রাখে, যার ফলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকে থকে। অর্থাৎ এই ঘটনাটি ও গ্যাসগুলি উপকারী বটেই। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি যে গ্রীনহাউস গ্যাস থাকে তা হল জলীয় বাষ্প। অন্যগুলি হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও ওজোন। এগুলি একটি নিরাপদ মাত্রার মধ্যে থেকে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি ও ঠিক থাকার পেছনে ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে শিল্পবিপ্লব (১৭০০-১৮৯০) পরবর্তী বিপুল শিল্পায়নের ফলে বিশেষত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নির্গমণ এত বেড়েছে যে, তার জন্য ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা একটি নিরাপদ মাত্রায় থাকার বদলে ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এত সহস্র বছরের পৃথিবীর তাপমাত্রা মাত্র বিগত বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বেড়ে চলেছে, যাকে বলা হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং। এর ভয়াবহ ফল কি তা বিস্তারিত আলোচনার দরকার এখানে নেই, যেমন মেরুর বরফ ও গ্লেসিয়ার গলে সমুদ্রজলের উচ্চতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে বহু রোগ সৃষ্টি, প্রাণীর বিলুপ্তি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে এটি বলা যায় মিথেনের নিঃসরণও বেড়েছে। বিশেষত মানুষ ব্যবসায়িকভাবে বিপুল সংখ্যায় গরু তথা গবাদি পশু (লাইভ স্টক) পালন করার ফলে। তবু দুধ ইত্যাদি ছাড়াও গোমাংস খাওয়ার প্রয়োজনে গোহত্যার কারণে এর সংখ্যা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষই স্বাভাবিক খাদ্য হিসেবে গোমাংস খান। এখন কোন কারণে যদি এই কোটি কোটি মানুষ যদি গোমাংস খাওয়া বন্ধ করে দেন, তবে গরুর সংখ্যা এত বাড়বে যে, তাদের মিথেনের জন্য ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা আরো লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে। আর এই তাপমাত্রা বাড়ার ফলে সমুদ্রের তলদেশের পলিতে ও জমাট বাঁধা 'মাটি' (ফ্রোজেন সয়েল বা আর্মাফ্রাট)—এসবে যে বিপুল পরিমাণ মিথেন আটকে আছে, তা নির্গত হয়ে আরো ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টির আশঙ্কা আছে।

যাই হোক গরুর নাক-মুখ দিয়ে প্রচুর মিথেন যে বাতাসে মিশছে তা এখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর এই নিরীহ চতুষ্পদটি জানেও না যে তার চেয়ে বুদ্ধিমান দ্বিপদ মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ তাকে মাতা হিসেবে পূজা করে, তার মাংস খাওয়ার বা রাখার জন্য অন্য মানুষকে মেরেও ফেলে। গরুর প্রতি এই কতিপয় মানুষের ভক্তির ব্যাপারটা তারাই জানে, গরু জানে না। গরু এটিও জানে না যে ভক্তির প্রাবল্যে এইসব মানুষদের কেউ কেউ তার শারীরতাত্ত্বীয় ব্যাপারটিই অস্বীকার করছে। যেমন এই কিছুদিন আগে (জুলাই, ২০১৯) ভারতবর্ষ নামক পৃথিবীর একটি ভূখন্ডের উত্তরাখণ্ড নামক রাজ্যের শীর্ষ ব্যক্তি অর্থাৎ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, গরুই একমাত্র প্রাণী যে শুধু অক্সিজেন শ্বাসের সঙ্গে নেয় এবং শ্বাসের সঙ্গে ছাড়ে।

মুস্কিল হচ্ছে প্রাণীবিজ্ঞানীরা একমত ও এটি প্রমাণিত যে গরু ও অন্য প্রাণীদের মতই স্বাভাবিকভাবে বাতাস শ্বাসের সঙ্গে নেয় এবং বাতাসের অক্সিজেন তার রক্তে মিশে সারা শরীরে ছড়িয়ে গিয়ে শারীরিক ক্রিয়াকে শক্তি জুগিয়ে সচল রাখে। ফলত কম অক্সিজেন ও বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড যুক্ত বাতাস সেও নিঃশ্বাসের সঙ্গে ছাড়ে। কিন্তু সঙ্গে ছাড়ে ঐ মিথেনও, যা আসে ঘাস, শাকপাতা হজম করার তার বিশেষ প্রক্রিয়ায়।

ভক্তির জোরে গরুর নিঃশ্বাসের সঙ্গে শুধু অক্সিজেন ছাড়ার ব্যবস্থা করা আর মিথেন ছাড়া বন্ধ করা যে সম্ভব নয়, তা গরুও জানে, —জানে না শুধু গোমাতার ঐ ধরনের কিছু সন্তান। জানে না বলেই সঙ্গে সঙ্গে এও বলা হয়েছে, গরুকে গোমাতা বলা হয় কারণ যে প্রাণবায়ু (অক্সিজেন) দেয়, গরুর গা মালিশ করলে শ্বাসরোগ সেরে যায়, গোবর ও গোমূত্র হৃদপিণ্ড, কিডনি তথা শরীরের পক্ষে উপকারী এবং গরুর কাছে থাকলে যক্ষ্মা সেরে যায় কিন্তু এগুলির কোনটিরই বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তি নেই, মুখ্যমন্ত্রী বললেও নেই। তবে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেছেন, “আমাদের বিজ্ঞানীরা এইসব ঘটনাকে মান্যতা দিচ্ছেন।” বিজ্ঞানকে পাল্টানোর কাজে লেগে পড়া এই ‘আমাদের বিজ্ঞানী’-দের নিয়ে ভয় আরো বেশি।

(সংবাদসূত্র–দি টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৬.০৭.২০১৯)

email:sahoo23319536@gmail.com • M. 8777598939

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চুল পাকে কেন?

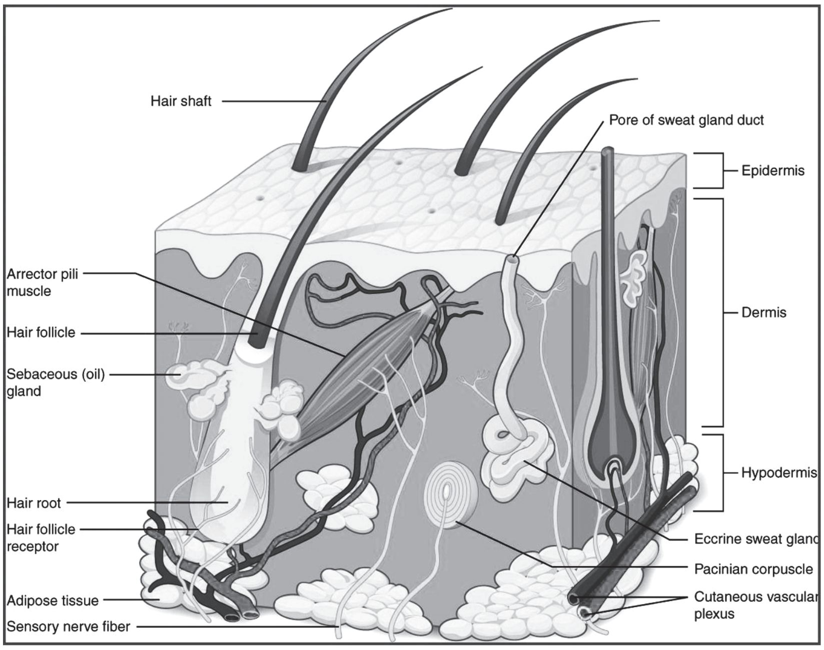

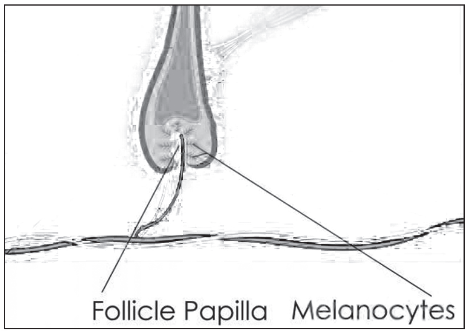

বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের চুলে পাক ধরে। ধীরে ধীরে সব চুলই সাদা হয়ে যায়। এমনটা হওয়ার কারণ চুলের কোষে রঞ্জক পদার্থের উৎপাদন কমে যাওয়া। আমাদের শরীরে কেরাটিনোসাইটস কেরাটিন প্রস্তুত করে। কেরাটিন হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিন কোষ যা আমাদের চুল, চামড়া আর নখ গঠন করে এবং স্বাস্থ্যবান রাখে। চুলের এই কেরাটিনকে আবার রঙ সরবরাহ করে মেলানিন নামে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ। এই মেলানিনের কারণে চুলের রঙ কালো হয়। গায়ের রঙ কেমন হবে তাও নির্ভর করে এই রঞ্জক পদার্থটির উপর। মেলানিন যার শরীরে যত বেশি থাকে সে তত কালো হয়, আর যার যত কম থাকে সে তত ফরসা হয়।

চুলকে মূলত দুভাগে ভাগ করা যায়—শ্যাফট এবং রুট। শ্যাফট আমাদের মাথার খুলি বা শরীরের ত্বকের উপরে থাকে। আর রুট হল চুলের নীচের অংশ অর্থাৎ খুলি বা ত্বকের সঙ্গে যে অংশটি যুক্ত থাকে। মূলত চুলের শ্যাফট অংশটিই কালো বা অন্যান্য রঙের হয়ে থাকে। প্রতিটি চুলের রুট ত্বকের নীচে একটি টিউবে যুক্ত থাকে। এই টিউবকে বলা হয় হেয়ার ফলিকল। হেয়ার ফলিকলের অভ্যন্তরে মেলানোসাইটস নামক কোষ থাকে। এই কোষ থেকেই মেলানিনের উৎপত্তি। এটি আমাদের সারা শরীরেই আছে। যে প্রক্রিয়ায় মেলানিন উৎপাদিত হয় তাকে মেলানোজেনেসিস বলে। মূলত দুই ধরনের মেলানিন রয়েছে—ইউমেলানিন যা চুলের রঙ কালো হতে সাহায্য করে আর ফিওমেলানিন যা হলুদাভ রঙের জন্য দায়ী। এই দুই প্রকারের মেলানিন কীভাবে ও কী পরিমাণে মিশ্রিত হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে চুলের রং কেমন হবে। কেরাটিনে স্বল্প মেলানিনের উপস্থিতি চুল পাকার অন্যতম কারণ। চুল সাদা হয়ে যায় অর্থাৎ পেকে যায় যখন কেরাটিনে কোনো মেলানিন থাকে না। অতিরিক্ত দায়িত্ব, কাজের চাপ, উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা ইতাদির কারণে অনেক সময় চুলের কোষে রঞ্জক পদার্থের উৎপাদন কমে যায়। তখন অল্প বয়সেও অনেক সময় চুল পেকে যায়।

email:kbb.scwriter@gmail.com • M. 9433145112

ত ন্ম য় ধ র

অন্য ব্রহ্মাণ্ডের উঁকি

গন্ডগোল! বিস্তর গন্ডগোল! আর সেই গন্ডগোলের বিস্তার ব্রহ্মাণ্ডকে ছাপিয়ে গিয়েছে। গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়েছিল দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে এরিডানাস বা নদী নক্ষত্র-মণ্ডলীতে থাকা একটি কালো ছোপ থেকে। প্রথম দর্শনে ছোট একটি ছোপ মনে হলেও পরে হিসেব কষে দেখা গেল, প্রায় ৮০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে থাকা ওই কালো ছোপ আসলে অতিকায় প্রায় ১০০ কোটি আলোকবর্ষ তার বিস্তার। ব্রহ্মাণ্ডের অন্য অংশের চেয়ে গড়ে প্রায় ৭০ মাইক্রোকেলভিন ঠান্ডা (এর কোন কোন অংশ ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে প্রায় ১৪০ কেলভিন ঠান্ডা) এই কালো ছোপ বিজ্ঞানীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিল। ২০০৪ সালে নাসার 'উইলকিনসন অ্যানাইসোট্রপি প্রোব' (WMAP)-এর পর্যবেক্ষণে প্রথম ধরা পড়ে এই সুবিশাল কালো ছোপ বা শূন্যস্থানটি। তাজ্জব বিজ্ঞানীরা কিছুতেই এর রহস্যভেদ করতে না পেরে দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ চালান। ২০১৩ সালে প্লাঙ্ক স্যাটেলাইটের পর্যবেক্ষণ কালো ছোপের অস্তিত্ব নিশ্চিত করে। পদার্থবিদ্যার কোন তত্ত্ব দিয়েই ব্যাখ্যা করা গেল না তাকে। একমাত্র সমাধানের রাস্তা রইল সমান্তরাল বহুবিশ্বতত্ত্বে।

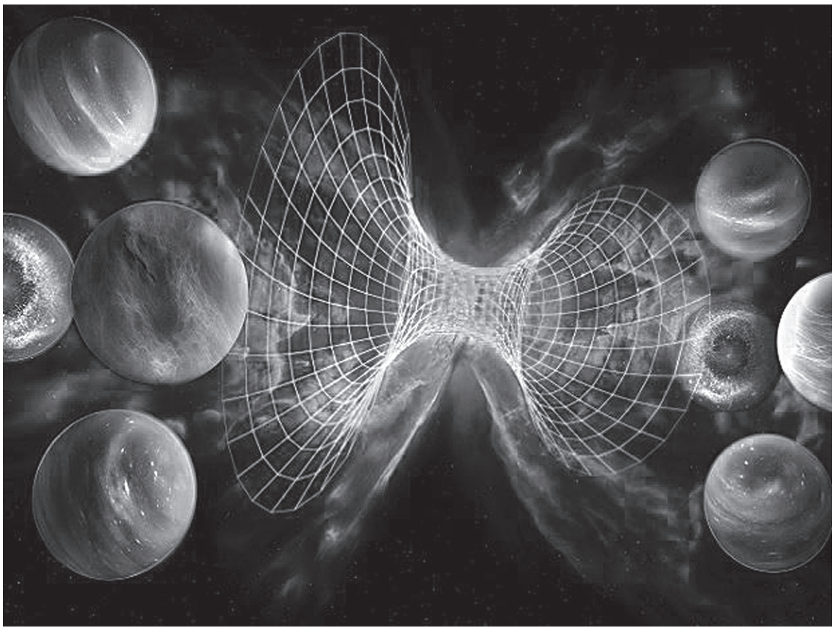

নাসা অঙ্কিত সমান্তরাল মহাবিশ্বে কাল্পনিক ছবি

লরা মেসিনি হাউটন এই কালো ছোপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথম ইঙ্গিত করেন যে এটি আমাদের মহাবিশ্বের সমান্তরাল কোন মহাবিশ্বের পদচিহ্ন হতে পারে। মহাজাগতিক স্ফীতি বা ইনফ্ল্যাশন দ্বারা পৃথক হওয়ার আগে মহাবিশ্বের মধ্যে এই ধরনের কোয়ান্টাম ফাটল সৃষ্টি হতেই পারে। হাউটনের বক্তব্য অনুযায়ী, স্ট্যান্ডার্ড সৃষ্টিতত্ত্বের মডেল এরকম মহাজাগতিক সুবিশাল কালো ছোপকে ব্যাখ্যা করতে পারবে না। হাউটন আরো বলেছেন, আমাদের মহাবিশ্বের প্রান্তের বাইরে অন্য মহাবিশ্বের ছাপ ঠিক এই ধরনেরই হওয়ার কথা। অ্যান্থনি আগুইরে, ম্যাট ক্লেবান, ম্যাট জনসন প্রমুখ বিজ্ঞানীরাও অনেক দিন ধরে একইরকম কথা বলে আসছিলেন। কিন্তু আমাদের দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের

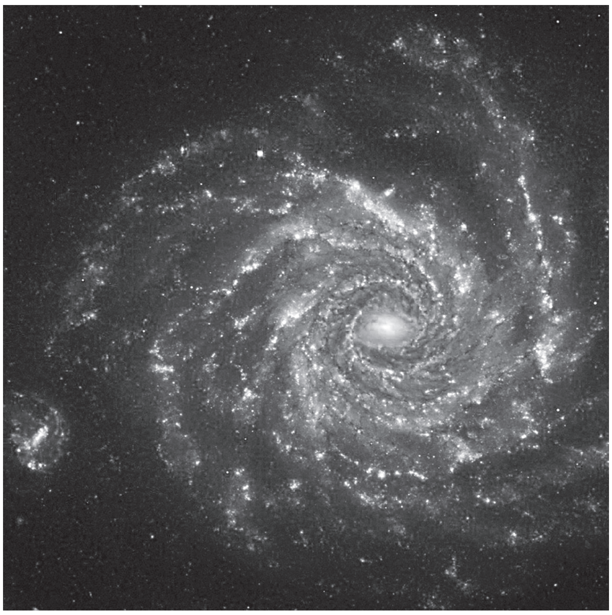

এরিডানাস নক্ষত্রমণ্ডলী

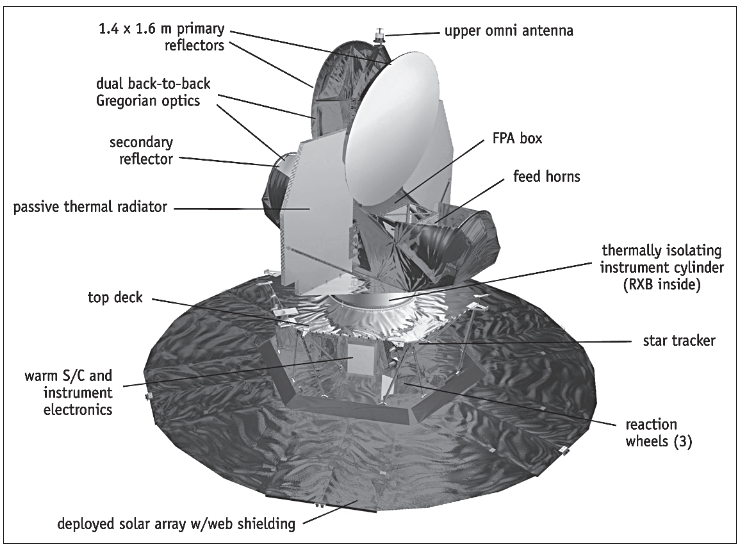

WMAP মহাকাশ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের চিত্র

লরা মেসিনি হাউটন

ভেতর এরকম সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না। সমান্তরাল ব্রহ্মাণ্ডের যতই তাত্ত্বিক মডেল থাকুক না কেন, হাউটনের দাবি সত্যি হলে ৮০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের ওই কালো ছোপই সমান্তরাল মহাবিশ্বের প্রথম হাতে-কলমে প্রমাণ। এবং এটি স্ট্রিং তত্ত্বও সমর্থন করবে। হাউটনের অনুগামীরা দাবি করেছেন যে এই সমান্তরাল মহাবিশ্ব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপযুক্ত প্রমাণ তাঁদের হাতে আছে। সেক্ষেত্রে আকাশ গোলকের বিপরীত গোলার্ধে (উত্তর মহাজাগতীয় গোলার্ধে) এর মত একটি শূন্যস্থান থাকার কথা। নিউ মেক্সিকো 'ভেরী লার্জ অ্যারে' গবেষণার ফলাফলে

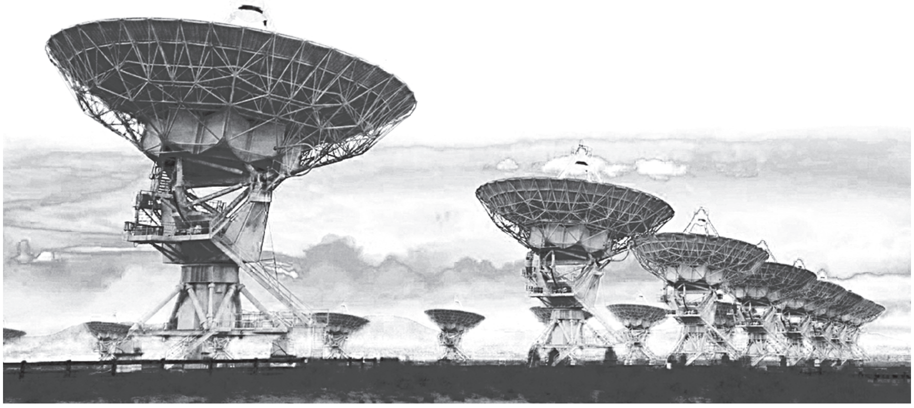

এর উত্তর খুঁজছেন আশাবাদী বিজ্ঞানীরা। এবং একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটেশনাল বিশ্লেষণ (কোলোমোগোরভ জটিলতার মাধ্যমে) উপগ্রহলব্ধ তথ্যগুলি থেকে সত্যিই আকাশ গোলার্ধের উত্তর এবং দক্ষিণে অমন ঠান্ডা এবং অন্ধকার ছোপের প্রমাণ পেয়েছে। স্টিফেন ফিনী এবং তার দল 'মডুলার এজ ডিটেকশন এলগোরিদমের' সাহায্যে WMAP ডেটার সংঘর্ষের ক্ষতস্থানগুলো নির্ণয় করেছেন। তারা দেখেছেন অন্ততঃ চারটি জায়গায় এরকম সংঘর্ষের পদচিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে; তার মানে অতীতে অন্ততঃ চারবার আমাদের মহাবিশ্বের সাথে খুব ছোট স্কেলে হলেও অন্য মহাবিশ্বের বুদ্বুদীয় সংঘর্ষ ঘটেছে।

বিজ্ঞানীরা সমান্তরাল মহা-বিশ্বের কথা বলে আসছিলেন বহুকাল ধরেই। আশির দশকে ইনফ্লেশন বা স্ফীতিতত্ত্ব নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের প্রান্তিক গণিতগুলো সমাধান করতে গিয়েই আলেকজান্ডার ভিলেঙ্কিন এবং আদ্রে লিন্ডে খুব অবাক হয়ে লক্ষ করলেন মহাজাগতিক স্ফীতি একবার শুরু হলে আর থামে না। আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি কিন্তু একাধিকবার ঘটতে পারে এবং হয়ত বাস্তবে ঘটেছেও। এই একাধিক মহাবিশ্বের অস্তিত্বের ব্যাপারটি প্রাথমিকভাবে ট্রিয়ন আর পরবর্তীতে মূলতঃ আদ্রে লিন্ডে এবং আলোকজান্ডার ভিলেঙ্কিনের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে। সৃষ্টির ঊষালগ্নে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (Expanding Bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শবিহীন অবস্থায় দূরে সরে গেছে। এ ধরনের অসংখ্য মহাবিশ্বের একটিতেই হয়ত আমরা অবস্থান করছি অন্য বিশ্বগুলোর সম্বন্ধে কিছু না জেনেই। ১৯৫২ সালে ডাবলিনে এরভিন শ্রোয়েডিঙ্গার একটি ভাষণে তাঁর নোবেল সমীকরণগুলি বর্ণনা করতে করতে শ্রোতাদের সতর্ক করছিলেন যে, তাঁর কথাগুলি হয়ত পাগলের প্রলাপ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সমীকরণগুলি বিভিন্ন ঘটনাক্রম বা ইতিহাস বর্ণনা করছে না, বরং ইঙ্গিত করছে যে, সবকিছু সমান্তরালভাবে একযোগে ঘটছে। অর্থাৎ অসংখ্য সমান্তরাল মহাবিশ্বের অস্তিত্ব আছে।

নব্বইয়ের দশকে দেশকালের উন্মত্ত প্রসারণ বা ইনফ্ল্যাশন নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা শুরু হয়। এডওয়ার্ড ফার্হি, এলেন গুথ এবং জেমাল গুভেন প্রমুখ বিজ্ঞানী তাত্ত্বিকভাবে দেখলেন দেশকালকে কেবল আইনস্টাইনের আপেক্ষিত তত্ত্ব অনুযায়ী ইচ্ছেমত বাঁকানো কিংবা প্রসারিত করাই যাচ্ছে না, স্থানকালকে টুকরো করে ভেঙ্গেচুরেও ফেলাও সম্ভব। আবার কখনো কখনো বৃহৎ মহাবিশ্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে খুব ক্ষুদ্র স্থান বা বিশ্বের জন্ম হতে পারে। সদ্যোজাত মহাবিশ্বকে 'শিশু মহাবিশ্ব' নামে অভিহিত করলেও মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে শিশু বিচ্ছিন্ন হবার পর অভিভাবকের সাথে

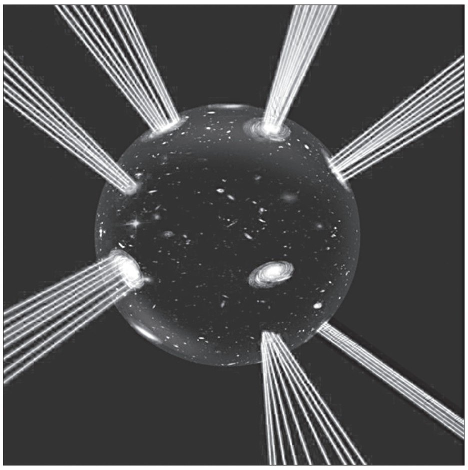

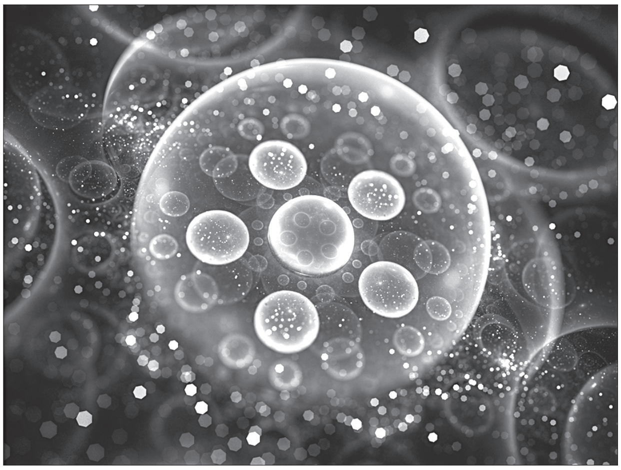

সম্প্রসারিত বুদ্বুদ

সেই শিশু মহাবিশ্বের কোন সম্পর্কই থাকে না। ডি'সিটার স্পেসে কোয়ান্টাম দোদুল্যমানতার ফলে কৃত্রিম বুদ্বুদ তৈরির মাধ্যমে শিশু মহাবিশ্ব উদ্ভবের প্রক্রিয়া এবং পুরো প্রক্রিয়াটি অসংখ্যবার অসংখ্যভাবে চালিত হয়ে তৈরি করতে পারে প্রায় অসীম সংখ্যক মহাবিশ্বের। সম্প্রতি স্ট্রিং তাত্ত্বিকরা তাদের বিখ্যাত "এম" তত্ত্বের মেলবন্ধনের মাধ্যমে এ বিষয়ে আরো বেশকিছু দূর অগ্রসর হয়েছেন। "এম" তত্ত্ব বলছে, কোয়ান্টাম দোদুল্যমানতার মাধ্যমে প্রায় $১০^{৫০০}$ টি ভ্যাকুয়াম স্তরের (vacuum state) উদ্ভব ঘটতে পারে এবং এ স্তরগুলো থেকে জন্ম নিতে পারে আলাদা আলাদা মহাবিশ্ব, যে সমস্ত মহাবিশ্বে বিভিন্ন ধরনের পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র কার্যকরী হতে পারে।

ম্যাসাচুয়েটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির বিজ্ঞানী ম্যাক্স টেগমার্কের প্রস্তাবনা অনুযায়ী, সমান্তরাল মহাবিশ্ব চারটি স্তরের হতে পারে :

স্তর ১ - একটি অসীম মহাবিশ্ব, যেখানে সম্ভাবনা তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর একটি প্রতিরূপ থাকবে।

স্তর ২ - মহাকাশের অন্য গভীর অংশ যাতে ভৌত স্থিতিমান বা ফিজিক্যাল প্যারামিটারগুলি আলাদা কিন্তু পদার্থবিদ্যার মৌলিক সূত্রগুলি একই থাকবে।

স্তর ৩ - অন্যান্য মহাবিশ্ব যেখানে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার বহুজাগতিক ব্যাখ্যা মেনে প্রতিটি সম্ভাবনাই উপস্থিত থাকবে।

স্তর ৪ - সম্পূর্ণ পৃথক সমান্তরাল মহাবিশ্ব যা আমাদের মহাবিশ্বের সাথে কোনভাবেই সংযুক্ত নয়, যার মৌলিক পদার্থবিদ্যাও সম্পূর্ণ আলাদা।

বহুবিশ্ব তত্ত্ব বলছে যে, হাজারো-লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের ভিড়ে আমাদের মহাবিশ্বও একটি। স্রেফ সম্ভাবনার নিরিখেই একটি মহাবিশ্বে ধ্রুবকগুলোর মান এমনিতেই অমন সূক্ষ্মভাবে সমন্বিত হতে পারে, অন্যগুলোতে হয়ত হয়নি। আমাদের মহাবিশ্বে ধ্রুবক এবং চলরাশিগুলো কোন একভাবে সমন্বিত হতে পেরেছে বলেই এতে প্রাণের উন্মেষ ঘটেছে; এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা অনুযায়ী আমাদের মহাবিশ্ব যাকে এতদিন প্রকৃতির পুরো অংশ বলে ভেবে নেওয়া হত, আসলে হয়ত এটি এক বিশাল কোন মহাজাগতিক দানবের (অমনিভার্স) খুব ক্ষুদ্র অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছু নয়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাক। লক্ষ কোটি মহাবিশ্বের মধ্যে কোনটি যে আকার, আয়তন আর বৈশিষ্ট্যে একদম ঠিক ঠিক আমাদের মহাবিশ্বের মতই হবে না, এমন তো কোন গ্যারান্টি নেই। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোও সেই মহাবিশ্বে একই রকমভাবে কাজ করতে পারে কিম্বা সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে। ম্যাক্স টেগমার্ক সনাতনী গাণিতিক সম্ভাবনার নিরিখে হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, আমাদের এই মহাবিশ্ব থেকে প্রায় $(১০^{১০})^{২৮}$ মিটার দূরে আমারই এক 'আইডেন্টিকাল টুইন' হয়ত আমার দিকে তাকিয়ে বসে আছে কিন্তু আমি তা জানতেই পারব না কোনদিন।

email:tstorm.tanmay@gmail.com • M. 9892359674

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

নিউটনের ক্ষ্যাপামি

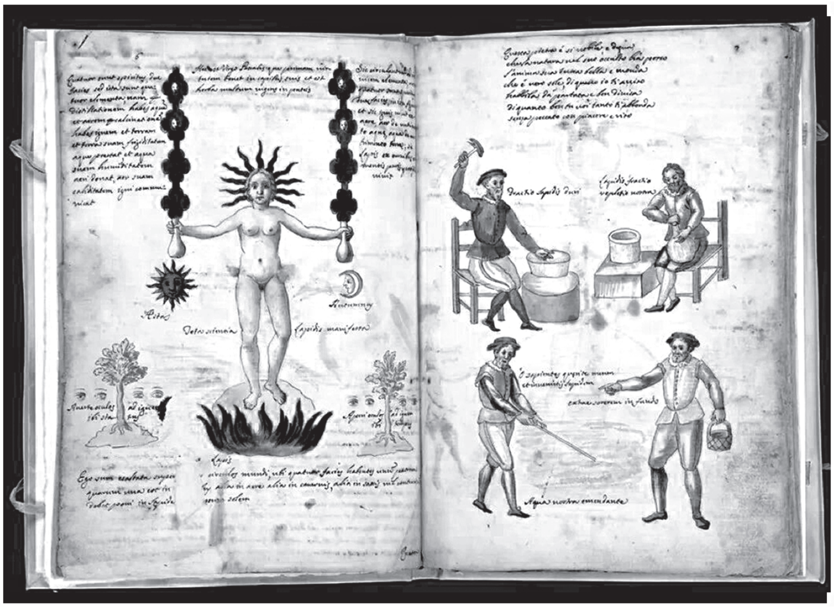

প্রাচীন অ্যালপেমি চর্চার চিত্রাঙ্কন

নিউটনের অ্যালপেমি চর্চা

বিজ্ঞানের জগতে সর্বকালের সেরাদের মধ্যে তাঁর নাম থাকবেই। তিনি স্যার আইজ্যাক নিউটন্। আলোর ধর্ম, সৌরজগতে গ্রহদের আবর্তন সংক্রান্ত নিয়মকানুন, মহাকর্ষ তত্ত্ব, ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস ইত্যাদি পদার্থবিদ্যা ও গণিতের অনেকগুলি বিষয়ের মৌলিক চিন্তাভাবনার পথ প্রদর্শক। তবে রসায়ন নিয়ে তাঁর আগ্রহ বা গবেষণার কথা তেমন একটা শোনা যায় না। অবশ্য যাবে কি করে বিজ্ঞানের জগতে রসায়নকে বিষয় হিসেবে আলাদা করে চিহ্নিত করার চল তখনো শুরুই হয়নি। তবে অ্যালকেমি নিয়ে চর্চা একটা কিন্তু ছিলই। আর তা

দু-হাজার বছর আগে থেকেই। চিন, ভারত, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে তখন থেকেই খুব মূল্যবান বলে বিবেচিত হত সোনা। খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চলে ডেমোক্রিটাস (ইনি গ্রীক দার্শনিক নন) নামে এক পণ্ডিত মানুষ থাকতেন। তিনি Physics et Mystica (বাংলায় 'প্রাকৃতিক এবং রহস্যজনক দ্রব্য') নামে একটি বই লিখেছিলেন। ছবি আঁকার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন রং ও রঞ্জক পদার্থ তৈরির কৌশলের পাশাপাশি সোনা তৈরির কথাও বলা ছিল সেখানে। যদিও সোনা তৈরির অংশটি লেখা হয় অত্যন্ত অস্পষ্ট ও জটিল ভাষায়। পরবর্তী কয়েক শতকে পারদ, গন্ধক ইত্যাদি কয়েকটি মৌল ও তাদের একাধিক যৌগকে নিয়ে দহন, পাতন, উর্ধপাতন ইত্যাদি নানা উপায়ে সোনা তৈরির চেষ্টা চালিয়ে গেছে মিশরীয়রা। বলাই বাহুল এসবে সাফল্য আসেনি। বরং গোপনে এই চর্চা হত বলে অ্যালকেমিস্টরা নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখতেন এক রহস্যের ঘেরাটোপে। ওনারা চেষ্টা চালিয়ে গেছেন হাজার বছর ধরে। অনেকেই হয়ত বিশ্বাস করতেন অমুক দেশের পণ্ডিতরা সত্যিই সোনা তৈরি করতে পারেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে দাঁড়িয়ে আইজ্যাক নিউটনও বিশ্বাস করতেন সেই কথা। শুধু তাই নয়, তিনি মনে করতেন অতীত পণ্ডিতদের সোনা তৈরির সেই কৌশল কালের প্রবাহে হারিয়ে গেছে। শুধু তিনিই নন, রবার্ট বয়েলের মত বিজ্ঞানসাধক বা জন লকের মত দার্শনিকও কিন্তু তাই বিশ্বাস করতেন। গোপনে সেই কৌশল খুঁজে বের করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন নিউটন। ১৯৪০ সালে জন মেনার্ড কেনিস নামে এক অর্থনীতিবিদের হাতে আসে একটি বাক্স। সেই বাক্স খুলে রীতিমতো চমকে উঠেছিলেন কেনিস। ২৫০ বছর ধরে সেখানে রাখা ছিল স্যার আইজ্যাক নিউটনের হাতে লেখা কতগুলি নোটবুক, যেখানে বিজ্ঞানী বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর অ্যালকেমি চর্চার দিনগুলির যাবতীয় কিছু।

তিনি বিশ্বাস করতেন পারদ থেকেই সোনা বানানো সম্ভব। প্রথমে খানিকটা মারকারি নিয়ে তিনি নাইট্রিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করেছিলেন, তারপর এতে একে একে মিশিয়েছিলেন আরও অনেক কিছু। কিন্তু সন্তোষজনক কিছুই না পেয়ে নিউটন পারদকে উত্তপ্ত করতে শুরু করলেন বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গে। রীতিমতো রাত জেগে বছরের পর বছর ফার্নেসের উচ্চ-তাপমাত্রায় তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন এই পরীক্ষানিরীক্ষা। এমনকি এই গবেষণায় আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি এবং লেডের মতো মৌলগুলিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। তবে এত কিছু করেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

তখন ১৬৭৫ সাল, তাঁর এই ধাতু সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল লিখেছিলেন প্রায় ১২০০ শব্দের এক প্রবন্ধে। ল্যাটিনে লেখা সেই প্রবন্ধের শিরোনাম Clavis, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'key' অর্থাৎ চাবি। তবে এই সময়েই তিনি ভয়ানক শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। পরিচিতরা লক্ষ করতেন রোগা ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া চামড়ার নিচে যেন ফুলে উঠেছে রূপোলী শিরার গতিপথ। অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য এবং আচরণেও পরিবর্তন দেখা যায় তাঁর। যে মানুষটি স্বভাবগত ভাবেই অত্যন্ত মেজাজি এবং অহংকারী, যিনি সমসাময়িক বিজ্ঞানী রবার্ট হুকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, নিজের ক্ষমতা অপব্যবহার করে গটফ্রেইড লাইবনিজকে চূড়ান্ত অপদস্ত করেন, তিনিই কিনা দার্শনিক জন লকের কাছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছেন। বন্ধু স্যাম্যুয়েল পেপি-কে চিঠি লিখেও তিনি নিজের শারীরিক অসুস্থতার পাশাপাশি এই অস্বাভাবিক আচরণের কথা জানাচ্ছেন। ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৬৯৩ সালে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলছেন এই ব্যাধির জন্য তিনি একটানা পাঁচ রাত ঘুমোতে পারেননি, অনেক কিছুই আর আগের মত মনে থাকছে না। এই সময়ে লেখা আরও কিছু চিঠিতে তাঁর অসুস্থতার লক্ষণগুলির সঙ্গে পারদ সংক্রান্ত বিষক্রিয়া বা মার্কারি পয়জনিং-এর মিল পাওয়া যায়। এই বিষয় নিয়ে ১৯৭৯ সালে Notes and Records of the Royal Society of London-এ দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গবেষকরা নিউটনের চুলের নমুনা নিয়ে নিউট্রন অ্যাক্টিভেশন এবং অ্যাটমিক অ্যাবজর্বশন অ্যানালাইলিস করে দেখেছিলেন সেখানে স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় চারগুণ বেশি লেড, আর্সেনিক ও অ্যান্টিমনি রয়েছে এবং মার্কারির উপস্থিতি স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় পনেরো গুণ। অর্থাৎ তাঁর জীবনের কোন এক পর্যায়ে তিনি সাংঘাতিকভাবে মার্কারি ও লেড বিষক্রিয়ার শিকার হয়েছিলেন।

সরাসরি পারদবাষ্পের সংস্পর্শে পরীক্ষানিরীক্ষার পাশাপাশি আরেকটি ব্যাপারেও গবেষকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নিউটনের প্রিয় রং ছিল লাল। তাঁর ঘরের দেয়াল সবসময় উজ্জ্বল লাল রং করা থাকত। এই কাজে পিগমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হত 'ভার্মিলিয়ন', রাসায়নিক দিক থেকে যা লেডের সালফাইড যৌগ। তবে এই বিষক্রিয়া তাঁকে গুরুতর অসুস্থ করলেও কেড়ে নেয়নি। বিজ্ঞানী জীবিত ছিলেন ৮৪ বছর। আর পাঁচটা বাচ্চার মত বাবা-মায়ের আদর জোটেনি তাঁর কপালে। জন্মের আগেই পিতৃহারা নিউটনের মা নিজের ২ বছরের শিশু সন্তান নিয়ে আবার বিয়ে করেছিলেন। মায়ের নতুন স্বামী সেই শিশুর কোনও দায়িত্ব গ্রহণে রাজি ছিলেন না। তাই দিদিমার কাছে বড় হয়েছিলেন তিনি। ভালবাসাহীন ছেলেবেলার দুঃসহ অভিজ্ঞতা তাঁকে গড়ে তুলেছিল বন্ধুহীন, সন্দেহবাতিক, বিশ্বাসহীন এক জটিল মানুষ হিসেবে। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেহে মার্কারি ও লেডের মত বিষাক্ত মৌলের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি জনিত প্রভাব। চরম হতাশার সময় একা একাই কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলতেন তিনি। প্রায় ২৫ বছর ধরে অ্যালকেমি চর্চায় নিয়োজিত রেখেছিলেন নিজেকে। এমনকি অ্যালকেমি ও ধর্ম নিয়ে লেখা দীর্ঘ ব্যক্তিগত ডায়রিতে তিনি লিখেছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর জগতের সত্যকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে ধরাধামে পাঠিয়েছেন। প্রাকৃতিক সত্যকে যিনি বিজ্ঞান ও গণিতের কষ্টিপাথরে যাচাই করে আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা করেছিলেন তাঁর নিজের ডায়রির পৃষ্ঠাতেই কিন্তু এইসব ক্ষ্যাপামির উল্লেখ পাওয়া যায়।

email:acnbu13@gmail.com • M. 8367965340

সংবাদ

জলঙ্গী নদী বাঁচাও আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান নদী জলঙ্গী নদী। এই দুই জেলার জীববৈচিত্র্য ধারণ করার জন্য যে জলসম্পদ দরকার তা ধারন করে জলঙ্গী নদী। জলঙ্গী নদীর দূষণ, গতিপথ পরিবর্তন ও জলের ধারা সংকুচিত হওয়া সহ বিভিন্ন সমস্যাগুলি নিয়ে 'জলঙ্গী নদী সমাজ' বিভিন্ন স্তরে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে। নদীতে অবৈধ বাঁধ (স্থানীয় ভাষায় বাঁধাল) নির্মাণ, নদীতে কালো জল, জলের ধারা হ্রাস, নদীর পাড় দখল করে অবৈধ নির্মাণ, বেআইনি মাছ চাষ ও কচুরিপানা বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে। নদী সমাজের সদস্যরা জানিয়েছেন জলের পরিমাণ হ্রাস ও দূষণের জন্য মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। ফলে মৎস্যজীবীদের আয় ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই দুটি জেলাই আর্সেনিক দূষণে

আক্রান্ত। ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কমিয়ে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করতে পারলে আর্সেনিক দূষণ অনেকটাই কমে যাবে। কৃষিক্ষেত্রে 'রিভারপাম্প' ব্যবহার করে চাষ করতে পারলে আর্সেনিক দূষণ ছড়িয়ে পড়বে না।

'জলঙ্গী নদী সমাজ' প্রায় ১ বছর যাবৎ নদীতীরবর্তী গ্রামগুলিতে নদী সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রচার কর্মসূচি, নাটক, গান ও পোস্টারের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া নদীকে আবার যৌবন ফিরিয়ে আনার জন্য ধারাবাহিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

এক সাক্ষাৎকারে জলঙ্গী নদী সমাজের পক্ষে কৌশিক সরকার জানিয়েছেন জলঙ্গী নদীকে বাঁধাল মুক্ত করার দাবিতে সাইকেল র‍্যালি, পদযাত্রা, পথনাটিকা, দেওয়াল লিখন সহ গ্রামে গ্রামে প্রচার চালাচ্ছেন।

সংবাদ

"সমাজের জন্য বিজ্ঞান" বই প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'সমাজের জন্য বিজ্ঞান' বইটির বিষয় উত্তর ২৪ পরগণার বিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাস। বইটির লেখক সুকল্যাণ গাইন। প্রকাশক গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদ। বইটি ১২ সেপ্টেম্বর 'পশ্চিমবঙ্গ না-ধার্মিক মানবতাবাদী' সম্মেলনে গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের সভাঘরে প্রকাশ করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক ডা. ভবানীপ্রসাদ সাহু ও বিজ্ঞানকর্মী অভিজিৎ বর্ধন। উপস্থিত ছিলেন দীপক দাঁ, জয়দেব দে, পাপাই শিকদার, অপূর্ব কর, সুকুমার মিত্র সহ বহু বিজ্ঞানকর্মী। লেখক শ্রীগাইন এই বইতে উত্তর ২৪ পরগণার জনবিজ্ঞান চর্চার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবের ঐতিহাসিক তথ্যগুলি তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৯ সালে গোবরডাঙায় প্রথম সর্বভারতীয় বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলনের কথা উল্লেখ রয়েছে। ১৯৪৮ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'-এর কথা সহ বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবের কথাও উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট (১৯৭৩), বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া (১৯৮০), নৈহাটি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড কালচার (১৯৮৩), হালিশহর বিজ্ঞান পরিষদ (১৯৮৩), মধ্যমগ্রাম বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম (১৯৮৪) সহ জেলার বিজ্ঞান

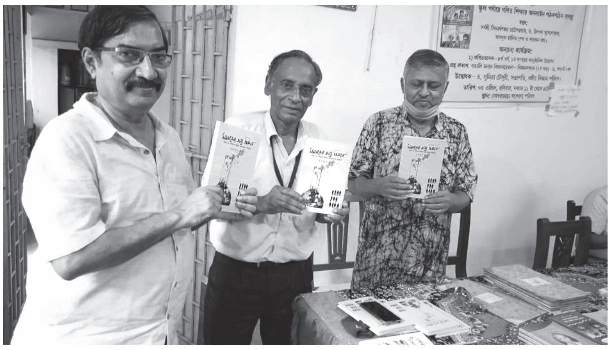

ক্লাবগুলি গড়ে ওঠার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জেলার বিজ্ঞান পত্রিকাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, উৎস মানুষ পত্রিকার গণবিজ্ঞান আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া প্রিজম, বিজ্ঞান সমাচার, কুশদং বার্তা পত্রিকাগুলির ভূমিকার কথাও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত 'অন্বেষক' পত্রিকাটির বিজ্ঞান দরবার প্রকাশ করেছেন। পরে ২০০৩ থেকে পত্রিকাটি 'বিজ্ঞান অন্বেষক' নামে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বিশ্লেষণ, 'মুখপত্র চেতনা' পত্রিকাগুলির কথাও বইতে উল্লেখ রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে পরিবেশ রক্ষায় জেলার বিভিন্ন সংগঠনের প্রয়াসগুলি এই বইতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৮০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পরিবেশ রক্ষার কাজগুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বিজ্ঞান সংগঠনগুলির জনকল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকাগুলির বিস্তারিতভাবে বর্ণনার পাশাপাশি জনকল্যাণমুখী আন্দোলনের কথাও উল্লেখ করেছেন। বইটিতে লেখক প্রতিটি অধ্যায়ের সূত্র নির্দেশ করেন। বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে এই বইটি একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হয়ে থাকবে।

বইটি বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশনার একটি প্রয়াস। পাঠকের ভালো লাগলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পাথেয় হবে।

বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশনা

যোগাযোগ	ই-মেল : bigyanannesak1993@gmail.com হোয়াট্স আপ : ৯৮৭৪৭৭৮২১৬, ৯১৪৩২৬৪১৫৯ দূরাভাষ : ৯৪৩৩৭৩১৮০১, ৯৪৭৪৩৩০০৯২ ৯২৩১৫৪৫১৯১

বিশ্বের ত্রাস নোভেল করোনা ভাইরাস আসলে কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ? এটা অনেকের মনেই ঘুরপাক খাচ্ছে। আবার বলা যায় 'করোনা' বিশ্বের কাছে সাম্যের বার্তা এনেছে। করোনা ভাইরাসের চরিত্রের মধ্যে সাম্যবাদী চরিত্র রয়েছে। পৃথিবীর খুব কমদেশেই তার রক্তচক্ষুর আড়ালে। ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র কেউই তার নজরের বাইরে নেই। সে শুধু ভয় পায় সামাজিক দূরত্ব, মাস্ক এবং অ্যালকোহল যুক্ত স্যানিটাইজারকে। তাঁর দেহের স্পাইকগুলির দারুণ ক্ষমতা। মানুষের সজীব কোশ পেলেই আঁকড়ে ধরে। এই আরএনএ সম্বলিত ভাইরাসটি খুবই মিউটেশন বা পরিবর্তন করতে পারে বারংবার। সেইজন্য নভেল করোনা ভাইরাস ঘন ঘন বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তনে সিদ্ধহস্ত। এই বৈশিষ্ট্যকেই মানুষ ভয় পায়।

বইটি নয়টি অধ্যায়ে সাজানো। লকডাউনের স্বার্থকতা হল—'ব্রেক দ্য চেইন'। রোগ কিন্তু নির্মূল হবে না। গোষ্ঠীর মধ্যে হার্ড ইমিউনিটি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত নিস্তার নেই। আমরা শুধু সেই অপেক্ষায় দিন গুনব। কোভিড-১৯ আমাদের সমাজে স্থায়ী সঙ্গী হয়ে গেল। তাকে নিয়েই জীবনপথে চলতে হবে। মাস্ক দীর্ঘদিন ধরেই পরতে হবে। পকেটে স্যানেটাইজারও রাখতে হবে। তবেই কোভিড-১৯-কে রোখা যাবে। কটা প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন নিয়ে সাবধান হওয়া যাবে? তাই নিজেদের সচেতনতা বাড়িয়ে সাবধান হতে হবে। বইতে এসব বিষয়ে বিস্তর আলোচনা রয়েছে।

BIGYAN ANNESWAK VOL : 18 Issue No. 5 September-October 2021 RNI : WBBEN/2003/11192 Rs. 15/-
ISSN 2582-5674

রা জা রা উ ত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

স্তন্যপায়ী — শজারু

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Indian Crested Porcupine*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Hystrix indica*

শজারু আগে ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া গেলেও আজ এটি বিপদগ্রস্ত স্তন্য পায়ী। সেইজন্য IUCN একে লাল তালিকায় স্থান দিয়েছে। একটা সময় পুরো মধ্য দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দেখা যেত। এরা সর্বভূক প্রজাতি। খাওয়া ও ঔষধি গুণ আছে ভেবে একে ব্যাপকভাবে শিকার করা হয়েছে ইতি পূর্বে। এদের দেহে বর্মের মতো লোম বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়ে 'কুইল' গঠন করেছে যা কাঁটার মতো দেখতে হয়। আত্মরক্ষার জন্য কেরাটিন নির্মিত এই 'কুইল'গুলো অনেক সময় কাজে ব্যবহার করে এরা।

সরিসৃপ — ভারতীয় ময়ূর কাছিম

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Peacock Softshell Turtle*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Nissonia hurum*

এই কাছিম ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়। আজ মূলতঃ গঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে কলকাতা কেন্দ্রিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। পূর্বে আসাম, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও রাজস্থানে পাওয়া যেত। আজ সবই ইতিহাস। IUCN-এর লাল তালিকা অনুসারে এরা বিপন্ন প্রজাতি।

পক্ষী — বিয়ার রাঙামুড়ি হাঁস

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Bae's Pochard*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Aythya baeri*

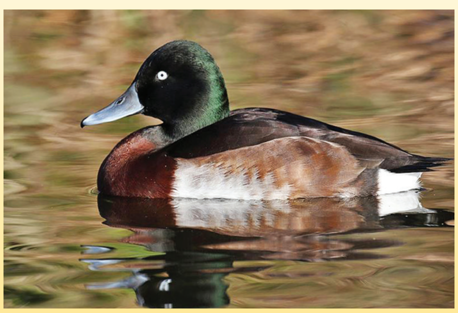

এই বিশেষ প্রকার রাঙামুড়ি হাঁস ২০১২ সালে IUCN-এর লাল তালিকায় তীব্রভাবে সংকটাপন্ন (Critically endangered) রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরা মূলতঃ দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া ও উত্তর-পূর্ব চিনের মূল বাসিন্দা। শীতের সময় পরিযান করে চিনের দক্ষিণ অংশ, ভিয়েতনাম, জাপান এবং ভারতে আসে প্রতি বছর। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিভিন্ন কারণে এদের সংখ্যা কমতে শুরু করে দ্রুতবেগে। আজ সারাবিশ্বে মাত্র ২০০-৩০০টি পাখি বেঁচে থাকতে পারে।

অমেরুদন্ডী — শ্রীলঙ্কার পিঁপড়া

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Sri Lankan Relict Ant*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Aneuretus simoni*

শ্রীলঙ্কার অত্যন্ত প্রাচীন পিঁপড়ে আজ মনোটাইপিক একমাত্র প্রজাতি। শ্রীলঙ্কাতে সীমাবদ্ধ। আজ এরা তীব্রভাবে সংকটাপন্ন প্রজাতি রূপে চিহ্নিত।

email:rajarouthbhbl@gmail.com • M. 9474417178